



৪০ বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ এপ্রিল - জুন ২০২০

সূচিপত্র

আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
কালবৈশাখীর ঝড়	বিবেক সেন	৫
করোনা ভাইরাস	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	৮
তুষার কাঞ্জিলাল স্মরণ		১২
সুজয় বসু স্মরণ		১৩
উৎস মানুষ ৪০	রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য	১৪
বহুবিবাহ: অক্ষয়, বিদ্যাসাগর	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	১৫
ভূয়ো খবর	অর্ক বৈরাগ্য	১৯
পেট্রা কেলি	নিরঞ্জন হালদার	২৩
অকপটে	সুস্মিতা মণ্ডল	২৬
প্রবাদ-প্রবচনে মেয়েরা	রিনি নাথ	২৭
পুস্তক পরিচিতি		৩০
চিঠিপত্র		৩১

প্রচ্ছদশিল্পী: দেবশিস রায়

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৮৯০২৪১২২৯০/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ / ৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: <http://www.facebook.com/utsomanush/>

করোনার দিনগুলি

যাঁদের বয়স আশি ছাড়িয়েছে, তাঁরা বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতার লড়াই, ময়নামত, কলেরা ও প্লেগ-মহামারী, ভারত-চীন যুদ্ধ— কত কি দেখেছেন! তাঁরা তা গর্ব করে বলেনও। একবিংশ শতকে এসে এক করোনা-ধাক্কা অতীতের যাবতীয় স্মৃতিগর্বকে ধুলিসাৎ করে দিল। একটা ভাইরাস যার নিজে থেকে এক পা-ও যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আক্রান্ত লোক হাঁচলেও দৌড় বড়জোর চার-পাঁচ ফুট। সে দিব্যি চীন থেকে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়ে ভারত তো কোন ছাড় পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত, মহাশক্তিধর রাষ্ট্রকেও কুপোকাত করে দিল।

কোথা থেকে এ রোগ ছড়ালো, কীভাবে ছড়ালো, কোনটা করলে আগেভাগে ঠেকানো যেত, এখন কী করণীয় ইত্যাদি নিয়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। এক-একজন বিশেষজ্ঞ এক-একরকম মতামত দিচ্ছেন। একজন বলছেন, মাস্ক পরার দরকার নেই, আরেকজন বলছেন মাস্ক-মন্ত্রই সারাক্ষণ জপতে হবে। কেউ বলছেন, ধাতু বা প্লাস্টিকের ওপর করোনা দু-তিনদিন বেঁচে থাকে, জামাকাপড়ে ফুটো (পোরাস) আছে, তাই খুব একটা সুবিধে করতে পারে না। কেউ বলছেন, দিনে চারবার জামাকাপড় কাচুন। কেউ বলছেন, ঘন ঘন গরম পানীয় খান করোনা প্রাথমিকভাবে গলায় আস্তানা গাড়ে, তারা কাবু হবে। আরেকদল বলছে, এসব ছেলেভুলনো কথা। এতে কিছু হবে না। উল্টে লোকের মধ্যে ভূয়ো আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।

আমাদের দেশ ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা জার্মানি নয়, এখানে প্রচার মাধ্যমগুলো সচেতনতার চেয়ে আতঙ্ক ছড়ায় বেশি। ইদানীং তাতে ইন্ধন জোগায় সোশ্যাল মিডিয়া। টিভিতে বিশেষজ্ঞ আর ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপে নানা ভিডিও উপদেশের ঠেলায় চারিদিক অন্ধকার। এপিডেমিকের অনুকরণে একে বলে 'ইনফোডেমিক'। এর জেরে গোমূত্র, লেবুজল, রেইকি, স্পেশ, হোমিওপ্যাথি থেকে এনার্জি থেরাপি— কী না চলছে!

'পরিয়ায়ী শ্রমিক' লজটা এই করোনা-যুগে হঠাৎ খুব চালু হয়েছে। কিন্তু বেচারারা জানে না, প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে

পরের পাতায়

শুধু পাড়ার লোক নয়, বাড়ির লোকই খেদিয়ে দেবে। শহরে হাসপাতালে চাকরি করা নার্স বা ডাক্তার নিজের বাড়িতে গিয়ে পাড়াপড়শীদের হাতে হেনস্থা হচ্ছেন, এ খবর আকছার মিলছে। সব পাড়াতেই একটা মাতব্বরকুল গড়ে উঠেছে। ঋতুবদলে একটু সর্দি বা জ্বরজ্বর ভাব হলেও তারা পুলিশে খবর দিচ্ছে। পুলিশ নিয়ে গিয়ে কোয়ারেন্টিন নামক খোঁয়াড়ে ভরে দিচ্ছে। সেখানে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। চিকিৎসক-নার্সরা প্রাণপাত করছেন। কিন্তু সব সরকারি কর্মচারী দেশপ্রেমে বা মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, এমনটি ভাবার এখনও কোনো কারণ ঘটেনি। আমাদের না আছে পরিকাঠামো, না কাজ করার মানসিকতা, ফল যা হওয়ার তাই। অথচ এই সময়েই আমাদের একজোট হয়ে লড়াইয়ের কথা। প্রমাণ করার কথা— ধর্ম নয়, বিজ্ঞানই পারে যে কোনো বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পারে।

করোনাকে কীভাবে মোকাবিলা করা উচিত, তার নমুনা হিসাবে রাজস্থানের ভিলওয়াড়া গ্রামকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু সারা বিশ্বে যে রাজ্য নজর কেড়েছে তা কেরল। ঠিক কেরল নয়, ওখানকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা। যাঁকে নিয়ে বিশ্বের তাবড় পত্রপত্রিকাও প্রশংসামুখর। ২০ জানুয়ারি চীনে করোনা আক্রমণের এক লাইনের খবর পড়ে যিনি চিকিৎসা-অভিজ্ঞ এক ডেপুটিকে ডেকে জানতে চান এই ভাইরাস ভারতে ছড়াতে পারে কি না। ডেপুটি জানান, ‘অবশ্যই পারে।’ ব্যস, আর কথা নয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্কুলের প্রাক্তন বিজ্ঞানশিক্ষিকা দল তৈরি করে ফেলেন। চার দিনের মধ্যেই জেলায় জেলায় খুলে ফেলেন কন্ট্রোল রুম। এ পর্যন্ত কেরলে করোনায় মৃত্যু হয়েছে মাত্র চারজনের। ওঁকে রাজ্যবাসী করোনা-হত্যাকারী আখ্যা দিয়েছে। রাজনীতি, প্রচারের ঢাকের আওয়াজ, এই মণ্ডকায় দু পয়সা কামানোর ফিকিরের ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে আসল উদ্দেশ্য।

কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে আবার গ্যাস-বিপর্যয়। ৭ মে ভোর ৩ টে নাগাদ অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের এলজি পলিমার প্ল্যান্ট থেকে স্টাইরিন গ্যাস বেরিয়ে শিশু-সহ ১২ জনের মৃত্যু হল। অসুস্থ হলেন হাজার দুই। কারখানার আশপাশের গ্রামে পড়ে থাকতে দেখা গেল অচেতন মানুষ আর মৃত গবাদি পশুকে। যেন ১৯৮৪-র ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি! সেবার তিন হাজারেরও বেশি মানুষ মারা পড়েছিল। ৩৬ বছর কেটে গেছে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে! মোদী সরকারের ‘সহজে ব্যবসা করার’ নীতি কারখানার নিরাপত্তা এবং পরিবেশ-বিধিকে অকেজো করে দিয়েছে। শুধু মুনাফাকেই

পাখির চোখ করলে কী হয়, এই বিপর্যয় তা আরেকবার দেখিয়ে দিল। সর্বস্বত্বের দাবি উঠেছে, অন্ধ ও কেন্দ্র সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা ও যথাযথ সহায়তা ও যত্নের ব্যবস্থা করা। কর্তব্যে অবহেলার জন্য এলজি পলিমার এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। দাবি তোলাই সার— যে দেশে ‘দোষীরা সব কেটে পড়ে বোকা সাজা পায়।’

করোনা-ডামাডোলেই সংবাদ শিরোনামে ‘বয়েজ লকার’। কিছু স্কুলপড়ুয়ার কীর্তি। এইখানে মেয়েদের নগ্ন ছবি জমা করা হয়। সেই সব মেয়ের শরীরী বৈশিষ্ট্য, নির্দিষ্ট করে বললে যৌনাঙ্গ নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে। এমনকি কাকে কীভাবে ধর্ষণ করা যায় বা উচিত তা নিয়েও মত-বিনিময় হয়। গত সত্তর-আশির দশকেও মাধ্যমিক পাস না করা অবধি অভিভাবকেরা ঘড়ির মতো জরুরি জিনিসও কিনে দিতেন না। একটা সাইকেলের জন্য তো রীতিমতো লড়াই চালাতে হত। এখন দুধের শিশুকেও ভুলিয়ে রাখতে মায়েরা হাতে মোবাইল তুলে দেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মোবাইল-পোক্ত হয়ে ওঠে। এরপর কিনে না দিলেই নয়। অতি-আদরলালিত ছেলেমেয়েরা শুধু একটা মোবাইল না পাওয়ার কারণে, বা মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির কারণে আত্মঘাতী হতেও পিছুপা হয় না। ফলে এখন স্কুলপড়ুয়া সবার হাতেই মোবাইল, যা কাজের জিনিস নয়, খেলনা। ‘বয়েজ লকার’-এর খবর প্রকাশ হতেই বিশেষজ্ঞরা গম্ভীর মুখে স্কুল থেকেই যৌনশিক্ষা, মেয়েদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা বাড়ানো ইত্যাদি নিদান হাঁকতে শুরু করেছেন। কিন্তু যদি কে তাঁরা দেখেন না বা দেখতে চান না, তা হল যৌনতার মতো আপাদমস্তক এক প্রাকৃতিক জিনিসকে তথাকথিত সভ্য মানুষ কীভাবে বিনোদনের উপকরণ করে তুলেছে। বিশ্বজুড়ে ব্যবসা ফেঁদেছে। কী চাই? শিশু-যৌনতা থেকে মানুষ-পশু— যা চাই পাবেন। এমনিই পাবেন। দিনে মাগনায় দু জিবি দেওয়া হচ্ছে কি মুখ দেখতে! কদিন আগেই এইসময় কাগজে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তা জানাচ্ছে কিশোরী মেয়েরা স্বেচ্ছায় বা বয় ফ্রেন্ডের অনুরোধে নিজেদের নগ্নতাকে মোবাইল ক্যামেরাবন্দী করছে। বিশ্বাস করে তাকে দিচ্ছে। তারপর নানা কারণে সেটা ভাইরাল হওয়ায় অনেকে লজ্জায় আত্মহত্যাও করছে। অঙ্গব্যবসা না যৌনব্যবসা— কার বাজার তেজি তা নিয়ে বিতর্কও চলতে পারে। যেখান ব্যবসা তথা বাজার জড়িত, সেখানে মূল্যবোধ, রুচিশীলতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি ছেঁদো কথা। অতএব আরও আরও চমকের জন্য অপেক্ষা করুন। যৌন-বিনোদন দীর্ঘজীবী হোক।

উমা

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি পটিয়সী বাঙালি

আশীষ লাহিড়ী

ভ্রলোক কলকাতার এক নামকরা গ্যাসট্রো-এন্টেরোলজিস্ট। একই সঙ্গে বাংলা ভাষা-অনুসন্ধিৎসু। তাঁর সঙ্গে বাংলা ভাষার বর্তমান এবং ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ আড্ডা হয় আমার। বর্তমান কলকাতার এই ট্যাঁশ-বাংলার আয়ু বেশি দিন নয়, এ বিষয়ে অনেকের মতো তিনিও একমত। আমি তাঁকে এই বলে ভরসা দিই, আসল বাংলা ভাষা তবু মরবে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখবে তারাই, যারা ভাষাটাকে দৈনন্দিনের কাজে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে— করতে বাধ্য হয়, কারণ তারা ইংরেজি জানে না। তারা বেশিরভাগই গ্রামে থাকে, যাদের আমরা বলি চাষাভূষো। টিভিওয়ালারা বহু সিরিয়াল দেখিয়েও তাদের বাংলা-রোগ থেকে মুক্ত করতে পারে নি। কিন্তু একদিন আচমকা এক গল্প ফেঁদে ডাক্তারবাবু আমায় বেশ বেকুব বানালেন। তাঁর চেহারাে বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মধ্যবয়সী একজন কৃষিজীবী রোগী এসেছিলেন। কী কষ্ট, জিজ্ঞেস করতে রোগী জানালেন, তাঁর ‘পটি’ হয় না।

ডাক্তারবাবু ভালোমানুষের মতো মুখ করে শুধালেন, ‘পটি কী?’ রোগী বেশ অবাক হয়ে বললেন, ‘পটি জানেন না! মানে পেট পরিষ্কার হয় না।’ ডাক্তারবাবু বললেন, ‘ও, তার মানে আপনার কোষ্ঠ সাফ হয় না?’— না, না, কোষ্ঠটোষ্ঠর কোনো কষ্ট নেই আমার। ‘তাহলে?’— ডাক্তারবাবু নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তিনি রোগীর মুখ দিয়ে প্রথমে ‘প’-বর্গের, তারপর একেবারে ‘ক’-বর্গের অসভ্য বাংলা কথাটি বলিয়ে ছাড়লেন। আমাকে ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন, ‘দেখুন, আপনার থিওরি অনুযায়ী যারা আসল বাংলাকে বাঁচাবে, তারাও পটি বলছে। কবে থেকে বাঙালি সাহেবরা, বাঙালি সুবোরা আর বাঙালি চাষাভূষোরা, ‘পটি’ শব্দটাকে জাতীয় মর্যাদা দান করেছে? তার ওপর, দেখলেন তো, এখন গ্রামেও মল, গ্রামেও আংরেজি মিডিয়াম। নইলে বাঙালি চাকরি পাবে না।’

ভাষাতত্ত্বের ছাত্র হলে নিশ্চয়ই অনেক বইটাই ঘেঁটে একটা ভালো পেপার নামাতে পারতাম: পটি-পটু বাঙালির বিশ্বজয়। কিন্তু আমার সম্বল তো নিছক কাণ্ডজ্ঞান। তার ভিত্তিতে এটুকু সহজেই বলা যায়, যখন থেকে ইংলিশ মিডিয়াম আর বাঙালিদের

ভাষাশিক্ষা সমার্থক হয়ে উঠল, যখন থেকে প্রি-প্রাইমারিতে ছানা ভর্তির জন্য বাড়িতে ‘ম্যাম’ রাখার চল উঠল, তখন থেকেই ‘পটি’র বাড়বাড়ন্ত। প্রথমে বাঙালি খোকাখুকুরা, পরে তাদের পাপা-মামা-আঙ্কেল-আন্টিরাও ‘পটি’-পটু হল। ম্যামের সামনে কি খারাপ খারাপ বাংলা কথা বলতে আছে? ছিঃ!

প্রসঙ্গত, সেদিন এক পুরোনো ইংরেজি ছবিতে দেখলাম, ‘ম্যামের’ ব্রিটিশ উচ্চারণটা ‘মা-ম্’। বাঙালিরা অবশ্য আজকাল ব্রিটিশ উচ্চারণকে গাঁইয়া বলে ঠোঁট বেঁকায়: অ্যান্টি-বায়োটিককে বলে অ্যান্টাই-বায়োটিক, সেমিফাইনালকে বলে সেমাই-ফাইনাল। আজকালকার একটা তত্ত্ব নাকি বলে, বিশুদ্ধ জ্ঞান বলে কিছু হয় না, যে-জ্ঞান ক্ষমতার হাত-ধরা, সেই জ্ঞানই আসল জ্ঞান। আজকের দুনিয়ায় ক্ষমতা তো আমেরিকারই, বিশেষ করে ইন্টারনেট-বিজয়ের পরে। কাজেই ব্রিটিশ ইংরিজির তুলনায় আমেরিকান ইংরিজির কদর (যেমন বাংলার তুলনায় হিন্দির কদর) বেশি হবে, এতে আর আশ্চর্যের কি!

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম দুবাই মল

ডাক্তারবাবুর প্রশ্নটাকে আমি এক ধাপ বাড়িয়ে নিতে চাই। আমার মতে, ইংলিশ মিডিয়ামটা একটা কারণ হলেও, ও দিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার হাইপোথিসিস: যখন থেকে বিশ্বায়নের, যার অপর নাম সর্ব-মার্কিনায়ন, ঠেলায় বাঙালিরা মল থেকে কেনাকাটা করতে— সরি, মার্কেটিং বা শপিং করতে শিখল, তখন থেকেই পটি-কালচারের প্রাদুর্ভাব। মলের সবকিছুই ঝকঝকে। সেখানে আমসত্ত্ব-ভাজাও

পরের পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

করোনা-কারণে এপ্রিল-জুন ২০২০ সংখ্যাটি ছাপা অবস্থায় প্রকাশ করা গেল না। আপাতত এটি অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গ্রাহকদের কাছে মুদ্রিত পত্রিকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সঃ

ছবির ফ্রেমে বাঁধানো। হাতগোটানো শার্ট আর পাজামা পরে বাজার করতে গেলে সেখানে ঢুকতেই দেবে না, লুঙ্গি পরে গেলে তো থানা-পুলিশ হয়ে যাবে। (অথচ নিজের চোখে দেখেছি, অভিজাত বার্মিজ মহিলারা রেশমের রঙিন লুঙ্গি পরে ঠিক বাঙালিনীদের বেনারসী শাড়ি পরার মতোই ঠমক দেখান) তাই মলে শপিং করে এসে বাড়িতে ঢুকে



মলাবেশে বিভোর বাঙালি ছানারা প্রকৃতির ডাকের বাংলাটি আর উচ্চারণ করতে পারে না, তাদের সুন্দর রঙিন প্লাস্টিকের ‘পটি’ ব্যবহার করতে হয় (আগে খবরের কাগজেই চলত)। তাই আমার প্রশ্ন, মল আগে না পটি আগে? মুরগি আগে না ডিম, কিংবা গাছ আগে না বীজ-এর মতো এ প্রশ্নও দার্শনিক বাঙালিকে অনেক দিন ধরে ভোগাবে, সন্দেহ নেই।

ইংরেজি ভাষা নিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়লে তা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য আমার একজন অক্সোনিয়ান সদৃশকু আছেন। ইংরেজি potty শব্দটার ঠিকুজি-কুঠি (কোঠ নয়) জানবার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হলাম। তিনি সব শুনে চিরকালের মতোই ঈষৎ ব্যঙ্গ আধখোলা চোখদুটি আমার দিকে মেলে বললেন, ‘পঞ্চাশ বছর আগে তোমায় বলেছিলাম, ভালো ইংরেজি শিখতে গেলে পি জি উডহাউস-এর হাসির গল্প দেদার পড়ো।’ আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, ‘পড়েছি তো। গাদাগাদা উডহাউস পড়েছি। এমনকি খোদ রাজশেখর বসুও যে উডহাউসের গল্প থেকে প্লট নিয়ে ‘রাজমহিষী’ নামে গল্প লিখেছিলেন, এতদিনে সেকথাও জেনেছি রাজশেখর-গবেষক দীপক গোস্বামী মশাইয়ের কাছ থেকে। ইংরেজিটা অবশ্য শেখা হয়নি তা সন্দেহে।

গুরুদেব আবার সেই আধবোজা চোখের আড়াল থেকে বললেন, ‘তাহলে তো তোমার পটি-সমস্যা থাকার কথা নয়। সেই গল্পটা, যাতে লর্ড এমসওয়ার্থের প্রতিবেশী জমিদার লর্ড ডানস্টেবল নিজেই নিজেই এমসওয়ার্থের কাসুল-এ নেমস্তন্ন করে দিনের পর দিন গ্যাট হয়ে অন্ন ধুংস করে চলেছে, সেটা মনে আছে?’ ‘সেই যার সিন্ধুঘোটকের মতো গোঁফ ছিল, আর ফুঃফুঃ করে ফুঁ দিলেই সেটা ঝুরঝুর করে একবার উঠত, একবার নামত? আর গোঁফের সেই ওঠাপড়া দেখবার জন্য লুকিয়ে বসে থাকত এমসওয়ার্থের বারো বছরের নাতি?’

‘হ্যাঁ, সেটাই। একবার হিসেব করে দেখো তো, ডানস্টেবল তাতে ঠিক কতবার ‘পটি’ শব্দটা উচ্চারণ করেছে এবং কী তার অর্থ।’

তখন সত্যিই আমার মনে পড়ল। এই ডানস্টেবল লোকটি ছিল সেয়ানা পাগল। আর তার মুদ্রাদোষ ছিল ‘পটি’ বলা। আপনি হয়তো জিগ্গেস করলেন, ‘আপনার ছেলের এখন খবর কী, স্যার?’—

‘ছেলে, আমার ছেলে? সে তো ডাহা পটি! নইলে কেউ পদ্য লেখে!’ তাঁর বাল্যসখী গ্রামভারি মেজাজের সুন্দরী লেডি কনস্টান্সের (কোনি) প্রতি এখনো বৃদ্ধার দুর্বলতা যায় নি। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, ‘কী সাহেব, আজ কোনির সঙ্গে কী কথা হল?’ তিনি তৎক্ষণাৎ বলবেন, ‘আরে ও তো একের নম্বরের পটি। ছোটবেলা থেকেই। কোনোদিন একটা স্বাভাবিক কথা বলেছে?’ আর লর্ড এমসওয়ার্থ, যাঁর ঘাড়ে বসে স্বেচ্ছা-নিমন্ত্রিত তিনি চারবেলা ভালোমন্দ উদরস্থ করেন, তিনি তো পটি-শিরোমণি! ‘ওকে কেন যে গারদের বাইরে রেখেছে!’ পাঠক নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন, ‘পটি’ শব্দের অর্থ কী? পারছেন না? সত্যি, আপনাদের মতো বাংলা-মিডিয়ামদের জন্যই আজ বাঙালির এই দুরবস্থা। আসুন তবে, খাস বিলিতি ডিকশনারি খুলে দেখা যাক। কেব্রিজ ডিকশনারি বলেছে, ওর মানে হল, silly or slightly crazy: মানে বোকা-বোকা, ছিটিয়াল, একটু খ্যাপাটে।

অক্সফোর্ড এককথায় বলেছে: crazy, পাগলাটে। কিন্তু না, ওর একটি মার্কিন অর্থও আছে: ছোটো পটুকে বলে পটি। ওয়েবস্টার বলেছে: a small child’s pot for urination or defecation — বাচ্চাদের হিসি অথবা হাণ্ড করার পাত্র। ব্রিটিশরা অবশ্য এ অর্থে শব্দটা ব্যবহার করে না। অন্তত করত না।

এবার তাহলে ছবিটা স্পষ্ট হল। যদিও বাঙালিরা ইংরেজি বলতে ব্রিটিশদের ভাষা বুঝত, তদ্দিন পটি শব্দের মানে ছিল খ্যাপাটে, পাগলাটে, বোকা - বোকা। কিন্তু যখন থেকে তারা মার্কিন ভাষাকেই মান্য ইংরেজি বলে শিখতে লাগল, তখন থেকে পটি হয়ে গেল ‘ছোট শৌচপাত্র’। একটু হিসেবে করে দেখবেন, কলকাতায় মলাটালিকা-স্থাপনের সময়ের সঙ্গে সেটা মিলে যায়।

কালবৈশাখীর ঝড়

বিবেক সেন

আমার অনেকদিনের বাসনা কালবৈশাখীর ঝড়ের কথা কিছু লিখি। কীভাবে শুরু করব, ভেবেও ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বর্ষশেষ’ কবিতার কথা মনে পড়ল। পড়ে দেখলাম, কবির কাব্যে কালবৈশাখীর যে ছবি ফুটে উঠেছে, তার চাহিতে ভাল আর কিছু হয় না। পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কয়েকটি পঙ্ক্তি তুলে দিচ্ছি।

‘ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া—
হানি দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে আসে সমাপন,
চৈত্র অবসান—
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লাস্ত বরষের
সর্বশেষ গান।’

কবির কাব্যে যে বাস্তবের সঙ্গে মেলে, তা দেখেই আমি কবিতার পঙ্ক্তিগুলিকে আমার রচনার আগমনী হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছি। ঈশানের পুঞ্জমেঘের কথাটাই ধরা যাক। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন যে, দিগন্তের উত্তর-পশ্চিম কোণে, যেটাকে আমরা ঈশান কোণ বলি, সেই কোণেই এটা প্রথমে সৃষ্টি হয়। এই মেঘটির শীর্ষভাগ অনেকটা ফুলকপির মতো। অনেকগুলি ছোট ছোট কপির মিলিত সমাবেশ। ছোট ছোট কপিগুলি সমবেত কপিটির থেকে একটু মাথা উঁচু করে আছে।



Cumulonimbus cloud (ঝড়ের মেঘ)

এই ধরনের মেঘকে আবহাওয়াবিদরা বলেন— কিউমুলাস (সিইউ) ক্লাউড। কবির ভাষায় ‘পুঞ্জমেঘ’। অনেকটাই মিল। এই মেঘ ক্রমশ বড় হয়ে যায়। শীর্ষভাগ পৌঁছে যায় ১৬ কিমি বা তারও বেশি উচ্চতায়। তখন এই মেঘকে বলা হয় কিউমুলোনিম্বাস (সিবি) ক্লাউড। শুরু হয় ঝড় ও বৃষ্টি, কখনও কখনও শিলাবৃষ্টি। এটা এগিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গের দিকে।



Cumulus cloud (পুঞ্জমেঘ)

কবি লিখেছেন— কালবৈশাখীর মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে ‘বাধা বন্ধহারা’। বাস্তবেও দেখি, এই মেঘ ধূলিঝড় উড়িয়ে অন্ধকার করে সামনের কোনো বাধা গ্রাহ্য না করে এগিয়ে চলে। ফলে ভেঙে পড়ে গাছ, ভাঙে কাঁচা বাড়ি। যেমন, ২০১৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল একটি ঝড়ে ঢাকা ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের ২৪ জন লোকের মৃত্যু হয়, আহত শতাধিক। অনেক মাটির ও টিনের বাড়ি ধূলিসাৎ হয়। বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা ও রেলপথ। অন্যদিকে, কালবৈশাখীর মেঘের বৃষ্টির কিছু উপকারিতাও আছে। আসামের চা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পাট, ধান ও চা-শিল্প উপকৃত হয়ে থাকে। আমরা কবিতা ও বাস্তবের মিল খুঁজে দেখলাম। আরও একটা মিল পেলাম কালবৈশাখীর তাণ্ডবের সময়ের মধ্যে। কবি বলেছেন— ‘বর্ষ হয়ে এল শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন, চৈত্র অবসান’। অর্থাৎ তিনি দেখেছেন, চৈত্রমাসের শেষে কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা যায়। আবহাওয়াবিদ জানাচ্ছেন, মার্চে কালবৈশাখী শুরু হয়ে থাকে। কিন্তু তা চলে এপ্রিল ও মে মাস পর্যন্ত।

আমার রচনায় কাব্য ও বিজ্ঞানের একটা মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। এবার কাব্যকে বিদায় দেওয়া যাক। বিজ্ঞানের কথাই বলি। কালবৈশাখী সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রয়োজন বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে এক হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত প্রচুর উষ্ণ জলীয় বাষ্প। এটা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প থেকে। সাহায্য করে বিহার-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে একটি হাঙ্কা নিম্নচাপ ও বঙ্গোপসাগরে একটা উচ্চচাপ অঞ্চল। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে আবহাওয়ার এরকম অবস্থা মাঝে মাঝেই দেখা যায়। এর সঙ্গে উচ্চস্তরে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা শুকনো, ঠাণ্ডা বায়ু থাকলে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হয় ‘ল্যাটেন্ট ইনস্টেবিলিটি’। এই কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কালবৈশাখীর মেঘ সৃষ্টি হওয়ার পর এটার শীর্ষভাগ ক্রমশ বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে পৌঁছনো দরকার। ল্যাটেন্ট কথাটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলে এটা সুপ্ত অবস্থায় আছে। একবার যদি কোনো মেঘ সৃষ্টি হয়ে এই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে তবে মেঘটি উচ্চ থেকে আরও উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবে। নিম্নস্তরে উষ্ণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু মেঘটি সৃষ্টি করে। তারপর তাকে উচ্চস্তরের শুকনো-ঠাণ্ডা বায়ু উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে। নীচের বায়ুস্তর যদি তার উপরের স্তর থেকে হাঙ্কা হয় তবেই সেটা উপরে উঠতে পারে। সাধারণত উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্তরের ঘনত্ব কমতে থাকে। তাই নীচের স্তরের বায়ু উপরে উঠতে পারে না। স্তরগুলি সাম্যাবস্থায় (স্টেবল) থাকে। যদি কোনো দিন নিম্নস্তরের পুঞ্জমেঘ অন্তত ১৮ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত নিজের শক্তিতে উঠে উচ্চস্তরের শুকনো ঠাণ্ডা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে, তখন এই সাম্যাবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে কারণ পুঞ্জমেঘের বায়ু উষ্ণ ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ হওয়ায় হাঙ্কা হয়, তাই সেটা উপরে উঠতে পারে। এটাকেই ল্যাটেন্ট স্টেবিলিটি বলা হয়েছে। কারণ যে বায়ুমণ্ডল স্থিতিশীল (স্টেবল) ছিল সেটা অস্থির (আনস্টেবল) হয়ে যাবে। ফলে পুঞ্জমেঘের শীর্ষ ক্রমাগত উর্ধ্বস্তরে দ্রুত পৌঁছে যাবে। পুঞ্জমেঘ পরিণত হবে ঝড়ের মেঘে, কিউমুলোনিম্বাস ক্লাউড রূপে।



Cumulonimbus cloud (ঝড়ের মেঘ), আরেকটি চিত্র

ঝড়ের বেগ যদি ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার বা তার বেশি হয় এবং সেটা অন্তত দু মিনিট স্থায়ী হয় তাকে আবহাওয়াবিদরা squall বলে থাকেন। এর বেগ প্রায়ই ঘণ্টায় ৪০ কিমি বা তারও বেশি হয়। কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিন্ডিংয়ে বসানো ডপলার রেডার (Dopplar radar) দিয়ে সেটাকে অনুসরণ করে কালবৈশাখীর গতিপথ চিহ্নিত করা যায়। বলা যায়, এটা কোথায়, কখন আঘাত করবে। এই ধরনের পূর্বাভাসকে nowcasting বলা হয়।

দেখা গেছে সৃষ্টি হওয়ার পর কলকাতা পর্যন্ত প্রায় ২৫০ কিমি অতিক্রম করতে এর প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা সময় লাগে। যাত্রাপথে মেঘটি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে এর শীর্ষভাগ পৌঁছে যায় প্রায় ১৬ কিমি পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে আসার পর এর শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়। তারপর ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবহাওয়া বিজ্ঞানীর কথা এইটুকুই থাক। আমরা বরং আবার কবির কাছেই ফিরে আসি। কবি পুরাতন ক্লাস্ত বরষের সর্বশেষ গানের পর কী লিখেছেন দেখা যাক।

‘ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে

ছুটে চলে চাষি—

তুরিতে নামায় পাল নদীপথে ব্রহ্ম তরী যত

তীরপ্রান্তে আসি।

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহের পিঙ্গল আভাস

রাঙাইছে আঁখি—

বিদ্যুৎবিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়

উৎকণ্ঠিত পাখি ॥’

কালবৈশাখীর আঘাতের পর চাষী, নৌকাবাহক ও পশুপাখির আতঙ্কিত মনোভাব কবি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবিটি বাস্তবের সঙ্গে যেমন মিলে গেছে, সেইসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, এই বর্ণনায় কবি আবারও তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

পরবর্তী কয়েকটি পঙ্ক্তিতে তিনি লিখেছেন—

‘...ধাও গান, প্রাণ-ভরা ঝড়ের মতন উর্ধ্ববেগে

অনন্ত আকাশে।

উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা

বিপুল নিশ্বাসে।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি— ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া

মত্ত হাহারবে

ঝঙ্কার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর

নৃত্য হোক তবে!...’

পড়তে পড়তে মনে হয়েছে কবি কালবৈশাখীর বিজ্ঞানটা সম্বন্ধেও অবগত ছিলেন। সেটাকেই ছন্দাবদ্ধ কবিতা রূপে আমাদের উপহার দিয়েছেন। বিজ্ঞান ও কাব্যের একটা মেলবন্ধন হয়েছে। কেন এমন মনে হয়েছে, সেকথা আমি যা বুঝেছি সেটা জানাই। কবি কাব্যে লীন অস্থিরতা (ল্যাটেন্ট ইনস্টেবিলিটি) বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এই বিজ্ঞানের কথাটা তিনি বুঝেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে— ‘ধাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মত উর্ধ্ববেগে অনন্ত আকাশে।’ মনে হয়েছে লীন অস্থিরতার ফলে পুঞ্জমেঘের বিশালাকার কিউমুলোনিম্বাস মেঘে পরিণত হওয়ার কথাই বলেছেন। বৃষ্টিপাতের নূপুরের নিক্কণ বেজেছে ‘উড়ে যাক, দূরে যাক ‘বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণপাতা’র অনুপ্রাণের ছন্দে। ‘বিপুল নিম্বাস’ বলতে তিনি হয়ত squall টাকেই বোঝাচ্ছেন। ঝঞ্জার মঞ্জীর ঝঙ্কত হয়েছে বজ্রগর্ভ মেঘের কর্ণবিদারক নিনাদের মধ্যে আর squall এর তাণ্ডব— ‘ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া মত্ত হাহারবে...’ এই ছত্রে। মৃত্যুরূপা শ্যামামায়ের সংহারমূর্তির তাণ্ডবনৃত্যের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে ‘উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্যে।’

শেষ কথা—

‘...মুক্ত করি দিনু দ্বার— আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বৃকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে...’

আমি আমার কর্মজীবন কাটিয়েছি আবহাওয়া অফিসের পরিমণ্ডলে। আমার ব্যাখ্যায় তার একটা প্রভাব পড়াই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কী মনে করে আমাদের জন্য এই অলঙ্কৃত ছন্দ রচনা করেছিলেন, তা এখন আর জানার কোনো উপায় নেই। পাঠকের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন নিজের মতো করে সেটা বুঝে নেন। অথবা এটাকে শুধু কাব্য হিসেবেই গ্রহণ করে তার রসাস্বাদনে তৃপ্ত থাকেন।

আমি ‘বর্ষশেষ’ কবিতাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি। তাই কবির কাছে ঋণী। পরিশেষে কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রণতি জানিয়ে আমার কথা সমাপ্ত করছি।

উমা

অশোকদা

অমিত চৌধুরী

বন্যা, খরা পেরিয়ে বিশ্বে,
আবার মহামারী!
এমন সময়,
আমরা কি আর
তোমায় ভুলতে পারি?
ছিলে তুমি সদাই সজাগ,
লেখায় ফিরত হুঁশ!
তোমার কথাই
আজও মানি,...
উৎস-ই মানুষ।

বিধিসম্মত ঘোষণা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী (১৯৫৬)-র
৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

- ১। প্রকাশস্থান: ৩৮ডি, প্রসন্ন নস্কর লেন
কলকাতা ৭০০ ০৩৯
- ২। প্রকাশকাল: ত্রৈমাসিক
- ৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: বরুণ ভট্টাচার্য
- ৪। মুদ্রণস্থান: জয়কালী প্রেস, ৮এ দীনবন্ধু লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৬
- ৫। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১ শশিভূষণ
নিয়োগী গার্ডেন লেন,
কলকাতা ৭০০ ০৩৬

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত
তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

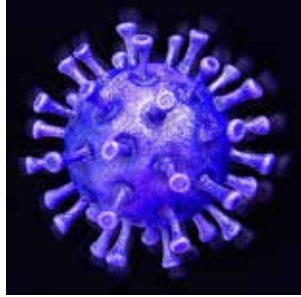
১ এপ্রিল ২০২০

বরুণ ভট্টাচার্য
প্রকাশক

আতঙ্ক, অসহায়তা, কর্পোরেট পুঁজি এবং করোনা ভাইরাস

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) করোনা ভাইরাস ঘটিত রোগকে প্রথম ধাপে পাবলিক হেল্থ ইমার্জেন্সিস অভ ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন (PHEIC) এবং পরে প্যাণ্ডেমিক বা অতিমারী বলে ঘোষণা করেছে। হু-দেওয়া পরপর পাঁচদিনের আন্তর্জাতিক তথ্য দেখে নেওয়া যাক। ১৫ মার্চ: ১,৫৩,৫১৭ জন আক্রান্ত (এর মধ্যে ১০,৯৮২ নতুন রোগী), মৃত্যু হয়েছে ৫৭৩৫ জনের। ১৬ মার্চ: আক্রান্ত ১,৬৭,৫১৫ জন (১৩,৯০৩ নতুন রোগী), মৃত্যু ৬৬০৬ জনের। ১৭ মার্চ: ১,৭৯,১১২ জন আক্রান্ত (নতুন রোগী ১১,৫২৬), মৃত্যু ৭৪২৬ জনের, ১৮ মার্চ: ১৯,১১,১২৭ জন আক্রান্ত (নতুন ১৫,১২৩), মৃত্যু ৭৮০৭। ২০ মার্চ: ২,৩৪,০৭৩ জন আক্রান্ত (নতুন ২৪২৪৭ জন), মৃত্যু ৯৮৪০ (নতুন মৃত্যু ১০৬১)। ২০ মার্চ: ২০২০-র স্ট্রাটেজিক রিপোর্টে হু জানাচ্ছে— Six new countries/ territories/ areas (African Region [2], and Region of the Americas [2], and Western Pacific Region [2]) have reported cases of COVID-19।



ছটি নতুন দেশ, এলাকা, অঞ্চলে (আফ্রিকার ২, আমেরিকার ২ এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ২) কোভিড-১৯ মিলেছে। হু-এর এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, রোগের তীব্রতা অদূর ভবিষ্যতে কমান কোনো লক্ষণ নেই। বরঞ্চ প্রতিদিনই বাড়ছে। পৃথিবীর প্রায় ১৭০টি দেশ আক্রান্ত। অনেকগুলো দেশে পুরোপুরি 'লকডাউন' চলাছে। চীনের পরে ইতালি এবং ইরান খুবই খারাপভাবে আক্রান্ত। এই দু দেশেই স্বাস্থ্য পরিষেবার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা দিয়ে রোগীর সংখ্যার সঙ্গে তাল মেলানো যাচ্ছে না। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। এ খবরগুলো কমবেশি সবাই জানে। এখানে যেটা উল্লেখ করা দরকার, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৮১%-র ক্ষেত্রে হয় মৃদু কিংবা জটিলতাহীন সংক্রমণ ঘটে, ১৪% ক্ষেত্রে অসুস্থতা গুরুতর চেহারা নেয় এবং হাসপাতালে ভর্তি ও অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হয়, আর মাত্র ৫% ক্ষেত্রে আইসিউ অ্যাডমিশন

করাতে হয়। যদিও নিউ ইয়র্ক টাইমসের (১৩ মার্চ, ২০২০) খবর অনুযায়ী, চীনে দুজন ২৯ বছর বয়স্ক চিকিৎসক মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং একজন মারা যান। জার্নাল অভ ভাইরোলজির মতো মান্য পত্রিকায় (১৭ মার্চ, ২০২০) প্রকাশিত হয়েছে— Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan: an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus। এ গবেষণাপত্রে অনেক জায়গা স্পষ্টতর হলেও অনেক জায়গা ধূসর। গবেষকেরা সেগুলো ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন কীভাবে বন্যপ্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি ভাইরাস এরকম তীব্রতায় মানুষকে আক্রমণ করছে, সেটা বোঝাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নেচার পত্রিকাতেও (১৭ মার্চ, ২০২০) প্রায় একই কথা বলা হয়েছে— The proximal origin of SARS-CoV-2।

আমরা এই মুহূর্তে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছি। পর্যায়গুলো এরকম— স্টেজ ১: এই পর্যায়ে কেবলমাত্র যারা ভাইরাস আক্রান্ত দেশে ঘুরেছে, তারাই আক্রান্ত, স্টেজ ২: স্থানীয় সংক্রমণ হয় অর্থাৎ যারা আক্রান্ত তাদের এবং তারা যাদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের চিহ্নিত করা যায়, স্টেজ ৩: কমিউনিটি সংক্রমণ যখন আর স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ নেই, যেমনটা ইতালি ও স্পেনে ঘটেছে, আমেরিকায় ঘটার মুখে, এবং স্টেজ ৪: যখন কমিউনিটি সংক্রমণের স্তর পেরিয়ে গেছে এবং কোনোভাবেই কিছু চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। পরিণতিতে সংক্রমণ মহামারীর চেহারা নিচ্ছে, যেমনটা চীনে হয়েছিল। চীন একে নিয়ন্ত্রণে এনেছে। উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ সালে SARS-এর যে সংক্রমণ চীন-সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা গোটা বিশ্বে ছড়িয়েছিল করোনা-আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা শুধু চীনেই তার চেয়ে বেশি। হু-র হিসেব অনুযায়ী, সার্স-এর আক্রমণে ২৯টি দেশে ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮,০৯৮, মৃত্যুহার প্রায়

১০%। এঝালা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৮,৬৫২। মৃত্যুহার প্রায় ৫০%। এ দুটির তুলনায় করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯-এর মৃত্যুহার অনেক কম। ৩থেকে ৪ শতাংশ। কিন্তু করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি এবং অত্যন্ত দ্রুত হারে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ। যার সঙ্গে তাপমাত্রার কোনো যোগাযোগ নেই। ঠাণ্ডা দেশেও যেভাবে ছড়াচ্ছে, গরম দেশেও সেভাবে ছড়িয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল ৫৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এর গতি প্রতিহত হবে। যে তাপমাত্রায় আমাদের বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, গত তিন-চারদিনের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ৩০%-রও বেশি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। কারণ, দ্রুত পরীক্ষা করার মতো কিট নেই। হু জানুয়ারি মাসে জানায়— Over 9200 additional novel coronavirus cases in China are suspected. There have been 132 related deaths, all in China. Outside of China, 68 cases have been confirmed. A WHO committee will reconsider whether to declare a Public Health Emergency of International Concern (PHIC) on Thursday. এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন হু-র দেওয়া ১৭ মার্চের পরিসংখ্যান। ফারাকটা প্রকটভাবে চোখে পড়বে।

চিকিৎসা-জগৎ ভাইরাস নিয়ে কী বলে?

(চারপাশটা সূর্যের ছটার মতো দেখতে বলে ভাইরাসটার নাম করোনা। গত ২৪ জানুয়ারি নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অভ মেডিসিন-এর সম্পাদকীয় বলছে— Another Decade, Another Coronavirus। এ ভাইরাসকে সে সময়ে 2019-nCoV নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, পরে নাম দেওয়া হয় COVID-19। ২০০২-০৩-এর SARS (severe acute respiratory syndrome- SARS-CoV) এবং ২০০৯-এর MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus)-এর এটা তৃতীয় অতিবৃহৎ সংক্রমণ। করোনাভাইরাস এক ধরনের আরএনএ ভাইরাস। এটা হওয়ার জন্য এই ভাইরাস সহজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন করে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। কারণ এতে আছে ‘error-prone RNA-dependent RNA polymerases’। যার ফলে ‘mutations and recombinations’ খুব ঘন ঘন হতে পারে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এ ভাইরাসের গায়ে খেলোয়াড়দের বুটের নীচের স্পাইকের মতো ‘স্পাইক প্রোটিন’ আছে, যার ফলে আক্রান্ত কোষের গায়ে ভালোভাবে লেগে থাকতে পারে। আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শুষ্ক শ্বাসনালীর উপরিস্তরের কোষে (epithelium) এরা সহজে বেঁধে যেতে পারে। এজন্য চিকিৎসকেরা বারেরবারে অল্প অল্প জল (১০০ মিলি পর্যন্ত) পান

করতে বলেন, যাতে গলা এবং শ্বাসনালী শুকিয়ে না যায়। এবং অবশ্যই সংক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি হলে তবেই এ নির্দেশ পালন করার কথা, সাধারণ অবস্থায় নয়।

এছাড়াও যেগুলো সহজে পালন করা যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো অল্প কথায় বললে—

(১) সাবান আর পরিষ্কার জল দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। সাবান না থাকলে অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যায়। দেখা গেছে করোনা ভাইরাসকে এক মিনিটের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যায়, যদি হাত বা অন্য কোনো স্থানে ৬২-৭১% অ্যালকোহল বা ০.৫% হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বা সাধারণ ব্লিচিং এজেন্ট যাতে ০.১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ব্যবহার করা যায়। (২) পরিষ্কার না করে চোখ মুখ নাকে হাত দেওয়া অনুচিত। (৩) হাঁচি কাশি পেলে রুমাল বা টিসু পেপার ব্যবহার করুন এবং একবার ব্যবহারের পরে রুমাল হলে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে নিতে হবে, টিসু পেপার হলে ফেলে দিন। (৪) নাক মুখ ঢাকা মাস্ক ব্যবহার করুন। অসুস্থ রোগীদের কাছে যাওয়া পরিহার করুন। (৫) প্রতিদিনের অবশ্য ব্যবহার্য জিনিসগুলি বারবার পরিষ্কার করতে হবে, জীবাণুমুক্ত করতে হবে। (৬) নিজের মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলে নিজেকে ঘরবন্দী করে রাখুন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যখন একজন অসুস্থ ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমণ ঘটানোর যে শৃঙ্খল, তাকে কেটে দেওয়া। এটা সফলভাবে করতে পারলে এখন যে ২য় পর্যায়ে রোগের অবস্থান, সেখানে আটকে রাখা যাবে। না পারলে প্রবেশ করবে ৩য় ধাপ বা স্তরে। অর্থাৎ রোগ তখন আর ব্যক্তিতে আটকে নেই, সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। করোনা ভাইরাসের R(0) 2.3-2.5। অর্থাৎ একজন করোনা-আক্রান্ত প্রায় তিনজনকে আক্রান্ত করার ক্ষমতা রাখে, নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়। অনিয়ন্ত্রিত হলে যে সংখ্যাটা কত হবে, তা অনুমান সাপেক্ষ। সে এক দুঃস্বপ্নময় ভয়ঙ্কর অবস্থা! এজন্য এখনই এই কঠোর সতর্কতা একান্ত জরুরি। সরকার এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে।

কেন ঘটবে এরকম? এ রহস্যও লুকিয়ে রয়েছে ভাইরাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। আক্রান্ত রোগীর একবার কাশি থেকে তিন হাজার জলীয় ছোট বিন্দু (ড্রপলেট) তৈরি হয়। এগুলো অন্য মানুষ, জামাকাপড় বা চারপাশের যে কোনো জিনিসের উপরিস্তরে জমে যায়। এ প্রমাণও আছে, আক্রান্তের মলে ভাইরাস বেশি দিন ধরে থাকতে পারে।

ঠিক কতদিন কোভিড-১৯ মানুষের শরীরে থাকতে পারে, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের এখনও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। দেখা গেছে, কোনো শক্ত উপরিস্তরে এ ভাইরাস কার্ডবোর্ড বা তামার পাত্রে চেয়ে বেশিদিন বাঁচে। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ

হেলথের বিজ্ঞানী Neeltje van Doremalen তাঁর প্রকাশিতব্য এক গবেষণাপত্রে লিখেছেন— কাশির পরে থুতু কণিকায় থাকা ভাইরাস তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বাতাসে বেঁচে থাকতে পারে।

সেগুলোর আকার ১-১৫ মাইক্রোমিটার (মানুষের চুলের চেয়ে ৩০গুণ কম চওড়া) স্থির বাতাসে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। যদি বাতাস আলোড়িত হয়, তাহলে এই জলীয় বিন্দুগুলো আরও তাড়াতাড়ি উপরিস্তরে ঘাঁটি গাড়ে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনও জানে না ঠিক কীভাবে মানুষের দেহের ভেতরে কোষের সঙ্গে এই ভাইরাস জোড় বাঁধে এবং সংক্রমণ শুরু করে। জানে না সংক্রমণ নিয়েও কীভাবে একজন মানুষ একেবারেই উপসর্গহীন থাকতে পারে, আবার একজন মরে যায়। যদিও মনে রাখা দরকার, যারা মারা গেছে, তাদের বেশিরভাগই বার্ধক্য, যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো কঠিন অসুখ ভুগছিল, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু যুহানের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বেশি সংখ্যক রোগীর মৃত্যু ঘটেছে মাল্টি অরগ্যান ফেলিওরে।

সমাজের যে অংশের মানুষ বেশি বিপজ্জনক অবস্থায়, তারা হল:

(১) ৬০-এর চেয়ে বেশি বয়সী, (২) ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা নিউমোনিয়ার মতো রোগে আক্রান্ত, (৩) যারা ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খাচ্ছে ইত্যাদি। তুলনায় শিশু এবং মহিলারা নিরাপদ। এছাড়াও আমাদের মতো দেশে যেখানে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ ফুটপাথে এবং বস্তিতে বাস করে এবং স্বাভাবিক নিয়মে, অস্তিত্ব ধারণের তাগিদ প্রথম হওয়ায় একেবারে গোড়ার হাইজিন এবং স্যানিটেশন সম্পর্কে অনিবার্ণভাবেই কোনো বোধ গড়ে ওঠেনি, সেখানে সংক্রমণ ছড়ালে কী পরিণতি হবে সহজ-অনুমেষ। এমনকি আজ যদি জাতীয় ইমার্জেন্সিও ঘোষিত হয়, তাহলেও এ অবস্থার খুব পরিবর্তন হবে কি?

করোনার মৃত্যুর প্রধান কারণ দুটি— ডাক্তারি পরিভাষায় বললে ‘cytokine storm syndrome’, যখন মাত্রাছাড়াভাবে শরীরের অভ্যন্তরীণ ইমিউন রেস্পন্স তৈরি হয়, যার ফলে আক্রান্তের ফুসফুস চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং (২) fulminant myocarditis, এতে অতি দ্রুত এবং মারাত্মক হার্ট ফেলিউর হয়, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসাধ্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ ACE2 inhibitor নিয়ে বিতর্ক। কিন্তু গত ১৭ মার্চ প্রকাশিত জার্নাল অভ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, ‘Patients taking ACE-i and ARBs who contract COVID-19 should continue treatment, unless otherwise advised by their physician!’ ব্যথা কমানোর ওষুধ ইবিউপ্রোফেন নিয়েও একই কথা।

একমাত্র তাড়াছড়ো করে লেখা ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি চিঠি ছাড়া আর কোথাও একে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এ নিয়ে গত ১৭ মার্চ নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।

এখনো করোনা-সংক্রমণের কোনো ধাপেই কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। অতি মারাত্মক কিছু ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে সার্স, এইচআইভি-তে ব্যবহৃত অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ও ক্লোরোকুইন বা ক্লোরামফেনিকলের মতো অ্যান্টিবায়োটিকের সম্মিলিত প্রয়োগ ফল দিচ্ছে। কিন্তু ১৮ মার্চ নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অভ মেডিসিনে প্রকাশিত ট্রায়াল রিপোর্ট (রাভামাইজড-কন্ট্রোলড— ওপেন লেবেল ট্রায়াল) ‘A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19’ জানাচ্ছে— In hospitalized adult patients with severe Covid-19, no benefit was observed with lopinavir-ritonavir treatment beyond standard care. ১৯ মার্চ নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অভ মেডিসিনে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে ‘Covid-19 - The Search for Effective Therapy’ খানিকটা বেদনার স্বরেই বলা হয়েছে— ‘What we lack is a specific antiviral agent to treat the infected

and, optimally, decrease viral shedding and subsequent transmission’. ফিন্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় একটি খবর বেরিয়েছে ‘Flu drug Avigan speeds up coronavirus recovery in early trials’। কিন্তু যতক্ষণ না একটি ওষুধ (রাভামাইজড-কন্ট্রোলড— ওপেন লেবেল ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাকে মান্যতা দেওয়া মুশকিল। যদিও চরম আতঙ্কের সময় মানুষ যে কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, এমনকি গৌমূত্রও!

হু এবং করোনা

১৬ মার্চ হু-র ডিরেক্টর জেনারেল এখনও আমরা যে জায়গায় যথাযথ নজর দিতে পারছি না সেদিকে দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: (১) টেস্টের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ানো, (২) আক্রান্ত এবং সন্দেহভাজন আক্রান্তকে আলাদা/ বিচ্ছিন্ন রাখা এবং (৩) যারা আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের খুঁজে বের করা। তাঁর ভাষায়: Social distancing measures can help to reduce transmission and enable health systems to cope... But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. তাঁর সর্বশেষ আহ্বান— Once again, our key message is: test, test, test। হু-র তরফে ১২০টি দেশে দেড় কোটি টেস্ট কিট পাঠানো হয়েছে। ডিরেক্টর জেনারেল স্মরণ করিয়েছেন,

এরকম সঙ্কটের সময়েই মানুষের মহোত্তম এবং কুৎসিৎতম দুটি চেহারা ই ধরা পড়ে।

মাস্ক নিয়ে হু

আপনি যদি সুস্থ হন তাহলে কেবলমাত্র করোনা-আক্রান্ত সন্দেহভাজনের দেখাশোনার সময়ে পরা দরকার। যদি আপনার হাঁচি কাশি থাকে, তাহলেও মাস্ক পরতে হবে। মাস্ক পরা তখনই কার্যকর, যখন বারবার সাবান জল দিয়ে হাত ধোয়া হবে কিংবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার করা হবে। মাস্ক ব্যবহার করলে জানতে হবে, কীভাবে এটা ব্যবহার করতে হয় এবং ব্যবহারের পরে ফেলে দিতে হয়।

করোনা: সময় সারণী

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে করোনা ভাইরাসের খবর আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পৌঁছয়। চীন সরকার দ্রুত এ খবর হু-র কাছে পাঠায় উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। ২০১৯-এর ২৯ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন পোস্ট জানাচ্ছে: Experts debunk fringe theory linking China's coronavirus to weapons research। ১৭ মার্চ, ২০২০-র Science Daily পত্রিকার শিরোনাম— 'COVID-19 coronavirus epidemic has a natural origin।' পরে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে: The analysis of public genome sequence data from SARS-CoV-2 and related viruses found no evidence that the virus was made in a laboratory or otherwise engineered. গত ২৭ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া কৃত্রিমভাবে নভেল করোনা ভাইরাস তৈরি করতে সফল হয়েছে। এতে ভবিষ্যৎ গবেষণার সুবিধে হবে।

সর্বশেষ চিন্তায় ফেলার মতো খবর হল: নেচার-এর মতো মান্য পত্রিকায় গত ২০ মার্চ একটি প্রতিবেদন: Covert coronavirus infections could be seeding new outbreaks। তাতে বলা হয়েছে, 'Scientists are rushing to estimate the proportion of people with mild or no symptoms who could be spreading the pathogen।' আমাদের কাছে অজানা কত সংখ্যক মানুষের মাঝে সুপ্ত হয়ে আছে এই ভাইরাস যেখান থেকে আবার সংক্রমণ ঘটতে পারে। কিন্তু এক ভাইরাসের গুঁতোয় বিশ্বসুদ্ধ গেল গেল রব পড়ে গেছে। কি মেডিসিনে, কি পর্যটনে, কি বিশ্ব-অর্থনীতিতে। একেই বলে গ্লোবলাইজেশন— 'আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লি থেকে বর্মা।' করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিন এবং কর্পোরেট পুঁজির রাজনীতি গত ১৬ মার্চ-এর খবর হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অভ হেল্থের তরফে প্রথম টিকে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে mRNA-1273। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত (ars Technica নিউজ চ্যানেল) একটি খবরের শিরোনাম: Trump

reportedly offered \$1 B to poach coronavirus vax for US use only। জার্মান ওষুধ কোম্পানি CureVac জানুয়ারি থেকে টিকে তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এই CureVac-এর ভ্যাকসিন কেনার জন্য ট্রাম্পের এই প্রলোভন দেখানো। আমেরিকায় বিতর্ক শুরু হয়েছে, জনসাধারণের করের টাকায় যে গবেষণা হয় তার ফল কেন বাণিজ্যিকভাবে বিপুল মুনাফার জন্য কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? রয়টার্স-এর খবর (১৫ মার্চ ২০২০) অনুযায়ী, Germany tries to halt US interest in firm working on coronavirus vaccine। সে খবরেই বলা হয়েছে যে CureVac-এর প্রধান লগ্নীকারী Horst Seehofer জানাচ্ছেন, তিনি টিকা বিক্রি করবেন না এবং এ টিকার লক্ষ্য হবে, 'help people not just regionally but in solidarity across the world।'

আমেরিকার আরেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বার্নি স্যান্ডার্স বলেছেন, তিনি নির্বাচিত হলে এই টিকাকে সম্পূর্ণত বিনামূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ৪৬ জন ডেমোক্র্যাটের সই-করা চিঠি ট্রাম্পকে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, We write to ask you to ensure that any vaccine or treatment developed with US taxpayer dollars be accessible, available, and affordable. That goal cannot be met if pharmaceutical corporations are given authority to set prices and determine distribution, putting profit-making interests ahead of public health priorities. Americans deserve to know that they will benefit from the fruits of their public investments. ১৯ মার্চ-এর নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরের শিরোনাম 'Search for Coronavirus Vaccine Becomes a Global Competition।' তাতে মন্তব্য করা হয়েছে, 'What began as a question of who would get the scientific accolades, the patents and ultimately the revenues from a successful vaccine is suddenly a broader issue of urgent national security. বিশ্ব কি এক্যবদ্ধ হচ্ছে, নাকি জাতীয়তাবাদ এবং মুনাফার উদগ্র বাসনা প্রধান বিষয় হয়ে উঠছে?

মানুষের বাঁচার জীবনকাঠিও কর্পোরেট পুঁজির আবর্তে পড়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান অর্থনীতির এই ধসের মাঝেও আমেরিকান বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি ইলি লিলি-র শেয়ার লাভের মুখ দেখেছে। কারণ এরা সর্বসাধারণে বিবৃতি দিয়েছে, করোনা ভাইরাসের নতুন চিকিৎসা নিয়ে আসছে।

বুঝ জন, যে জানো সন্ধান!

সম্প্রতি আমাদের দুই কাছের মানুষ, বুদ্ধি ও পরামর্শদাতা তুষার কাঞ্জিলাল ও সুজয় বসু প্রয়াত হয়েছেন।
গুঁদের প্রয়াণে বিজ্ঞান আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল। গুঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।



তুষার কাঞ্জিলাল প্রয়াত

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন
তুষার কাঞ্জিলাল। জীবনানন্দ সভাঘরে

গত ৩১ জানুয়ারি ২০২০ প্রয়াত হন তুষার কাঞ্জিলাল। তুষারবাবু জীবনের বেশিরভাগ সময়টা টানা ৩৫ বছর সপরিবার কাটিয়ে দেন। বিদ্যাধরী নদীর তীরে কুঁড়েঘর ছিল তাঁর আশ্রয়। সেখানকার বাদাবন আর নদীনালাকে হাতের তালুর মতো চিনতেন। আর ভালোবাসতেন স্থানীয় গরিবগুর্বো মানুষজনকে। ছিলেন তাদের সুখ-দুঃখের সাথী। তাঁরই কর্মকাণ্ডের জেরে সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া হয়ে ওঠে একটি আলোচিত নাম। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ আর খেয়ালি প্রকৃতিকে গ্রাহ্য না করে তুষারবাবু সুন্দরবনের মানুষের বড্ড কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। উৎস মানুষ আয়োজিত প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা শুরু হয় ২০০৯-এ। ২০১০-এ আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন তুষার কাঞ্জিলাল। কলকাতার কালিন্দী আবাসনে স্মারক বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে উৎস মানুষ কী ও কেন তা নিয়ে আলাপচারিতায় আগের বক্তা সুজয় বসুর প্রসঙ্গ ওঠে। তুষারবাবু সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়াতে সৌরশক্তি ব্যবহার করার উদ্যোগে সুজয় বসুর সাহায্যের কথা বলেন। আফসোস করেন এই বলে, ‘ভদ্রলোককে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে এ রাজ্য লাভবান হতে পারত।’ বিধুংসী আয়লা-পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের প্রকৃতি ও মানুষকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির ভেতর পড়তে হয়, তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তুষারবাবু। স্মারক বক্তৃতায় তিনি বলেন ‘গোটা পৃথিবী জুড়ে ভোগের পাগলামি চলছে।... সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট-এর একটা প্রধান কাজ ছিল এই যে, বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ হয়, তারপর যে ঘূর্ণিঝড় হয়, সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রথম ঝড়ের ধকল জঙ্গল সামলাত। এখন অর্ধেকের বেশি জায়গা জঙ্গল সাফ করে দিয়ে ঘূর্ণিঝড়কে দরজা পর্যন্ত রাস্তা করে দেওয়া হল সেখানে। তারপর বাদা জঙ্গলগুলোকে ফাঁকা করে দেওয়া হল। এই তিনটি সর্বনাশা কাজের ফলে আগামী ৩০-৪০ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা বিজ্ঞানীদের মত।’

প্রতিবেদন: বরুণ ভট্টাচার্য

সুজয় বসু প্রয়াত



অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন
সুজয় বসু। কলেজ স্ট্রিটের স্টুডেন্টস হলে।

দেশের যাঁরা মাথা অর্থাৎ নীতিনির্ধারণের কথা শোনেননি। আমরা বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তাকে তুড়ি মেদে উড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত। না, তুষারবাবু আপনার কথা শুনিনি, যেমন শুনিনি অধ্যাপক সুজয় বসুর কথা। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার প্রথম বক্তা। অধ্যাপক সুজয় বসু প্রয়াত হন ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০। প্রথমবার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার বক্তা। ‘শক্তি ব্যবহার ও সামাজিক সাম্য’ ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়। পরিবেশদূষণ নিয়ে বিশ্বজোড়া যে বিপর্যয়ের কথা প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে, তার জন্য মানুষের ভোগসর্বস্বতাকে তুলোধনা করেন বক্তৃতায়। ঘরে ঘরে এসির ব্যবহার, বিশেষত শহরাঞ্চলের মানুষের সীমাহীন ভোগবিলাসের চাহিদা মেটাতে যে শক্তি (বিদ্যুৎ) ব্যবহার করা হয়, তা উৎপাদন করার প্রক্রিয়া একদিকে যেমন ব্যয়বহুল অন্যদিকে পরিবেশদূষণের কারণ বলে মনে করতেন অধ্যাপক বসু। এই অপচয়কে আটকাতে তিনি প্রস্তাব দেন, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ করে শহুরে চাহিদাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। গরিব মানুষকে স্কলমূল্যে বিদ্যুৎ জোগান দেওয়ার কথাও বলেন। যাদবপুরে তাঁর ক্লাসে অনুপস্থিতি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, ‘এই যে তোমরা ক্লাস করছ না, তা ভারি অন্যায়। তোমরা কি জানো এত কম টিউশন ফি দিয়ে আর কোথাও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায় না! এ তো মাগনা আসে না, আসে সাধারণ মানুষের করের টাকা থেকে। দরকার হলে কলেজ ছেড়ে চলে যাও।’ এ ধরনের কড়া কড়া কথা বলতেন; তা সে যে কোনো অপচয় হোক না কেন! মাঝে মাঝেই বলতেন, ‘এত ফুটানি কিসের!’ তিনি ছিলেন বিকল্প শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রবক্তা। মাঠে-ময়দানে যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন তা নিয়ে প্রচার করেছেন। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে, একটি ঘরে এসি চালিয়ে ঠান্ডা রাখতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি লাগে, তাতে গ্রামের একটি রাস্তায় বেশ কয়েকটি ল্যাম্প পোস্ট বসানো যায়, পানীয় জল দেওয়া যায় ও রাস্তা তৈরি করা যায়। শহুরে মানুষের আরামপ্রিয়তা বজায় রাখতে যে বিপুল পরিমাণ তাপবিদ্যুৎ লাগে, তাকে তিনি অপচয় মনে করতেন। সভাসমিতিতে তা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতেন। সুজয় বসু গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন। এ রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে সুজয় বসু অগ্রপথিক ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ এনার্জি স্ট্যাডিজ-এর প্রধান মুখিয়া। পরমাণু বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী সুজয় বসুর সঙ্গে উৎস মানুষ-এর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। শেষ ক’বছর তা একটু শিথিল হয়ে যায়। তিনি উৎস মানুষকে নানান চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। জাদুকর গণপতি চক্রবর্তীকে নিয়ে উৎস মানুষে ধারাবাহিক লেখা পড়ে ভাল লাগাতে বলেছিলেন, ‘জানো, উনি আমার বাবার পরিচিত ছিলেন। বাড়িতে চা খেয়ে গেছেন। তোমরা গণপতি চক্রবর্তীকে নিয়ে লেখাটি বের করে খুব ভাল করছো!’

প্রতিবেদন: বরুণ ভট্টাচার্য

বাতিঘর

পুরনো সাথীদের কলমে অতীতচারণ। এই সংখ্যায় লেখক রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

দিনক্ষণ ঠিক খেয়াল নেই। সত্তর দশকের শেষ বা আশির শুরুর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকমহলে অশোকবাবুদের ঐ কাহিনীটা আচমকা খুব রটে গেল। শালগ্রাম শিলা যে আদতে একটি জীবাশ্ম তা নিয়ে রেডিও অনুষ্ঠান করে দুই রেডিওকর্মী বিপাকে পড়েছেন। এ আলোচনা কয়েকদিন সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সিঁড়িতে, পুঁটিরামের দোকানে প্রবলভাবে চলল। কে তাঁদের চেনে, করতে করতেই একটা নতুন বিজ্ঞানপত্রিকা হাতে এল। শীর্ণ চেহারা, তবে ভেতরের মশলা খুব তেজিয়ান। প্রোপাগান্ডার ভাবটা নেই, একগুঁয়েও নয়, বরং বেশ সুচিন্তিত। সব লেখার কথা মনে নেই, তবে জ্যোতিষ ও ন্যাভার মালা ও সম্ভবত সাপ নিয়ে নতুন ধরনের দু-তিনটি লেখার কথা আবছা মনে পড়ছে। আমাদের তখন আশুতোষ ভবনে দিবসরজনী কাটে। যুবকদের মন সেকালে নানাকারণেই বিক্ষিপ্ত। বহুমুখী প্রবণতার সেই যুবাদের মধ্যেও এ কাগজ যে জনপ্রিয় হল খুব দ্রুত, সেটা বোঝা যেত এভাবে, একটু দেরি হয়ে গেলেই পাতিরামে কপি মিলত না। তবে বন্ধুদের কারও-না-কারও ঝোলা থেকে বেরোত। কারা এ কাণ্ড করছেন, তা নিয়ে আলাপ করবার জন্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পিছনের এক গলিতে দু-তিন বন্ধুতে মিলে হানা দিলাম এক সন্ধ্যায়। দোকানটির নাম মনে নেই। সপ্তাহে একদিন বা দু দিন তখন উৎস মানুষের দলবল ওখানে বসতেন। গিয়ে দেখি আধো অন্ধকার ঘরে বছর ২৫-৩০-এর কয়েকজনের টান-টান ব্যস্ততা। লম্বাটে অপরিষর ঘরের ডানপাশের যতটা পারা যায় দখল নিয়ে কম করে ৮-৯ জন নানাকর্মে নিবিষ্ট। কেউ প্রফ দেখছেন, কেউ লিপি বানাচ্ছেন, একদিকে টেবিলের কানায় তিনজনে একটা লেখা নিয়ে লেগেছেন— রাস্তাতেও দুটি দলে নিমগ্ন আলোচনা চলছে। কে যেন ভাঁড়ে চা দিয়ে যাচ্ছে। একজন দ্রুত হেঁটে চুকেই একজনকে বেদম ধমক দিতে শুরু করল। তখনও অশোকবাবুকে কেন, কাউকেই চিনি না। নামও শুনিনি। ভাবছি কার সঙ্গে কথা শুরু করি। ভাবতে ভাবতেই ঝপ করে লোডশেডিং। আলো আন, মোমবাতি জ্বালাও— এসব ডাকাডাকির মাঝখানে আমাদের রণভঙ্গ দিতে হল। ‘উৎস

মানুষ’-এর সারথীদের চোখে দেখা হল, কারও বাঁশি শোনা হল না। উত্তরবঙ্গের গ্রামে হাতেকলমে কাজ করতে গিয়ে বোঝা গেল কুসংস্কার কাহারে কয়! স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, পুষ্টি সবদিকেই সরকারের বজ্রমুষ্টি খুলে কেউ যদি কোনোক্রমে দুটি টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন, তদগুণেই জনতার কুসংস্কার নতুন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে হাজির। কি প্রতাপ অন্ধবিশ্বাসের! কলকাতায় ফিরলাম তিন বছর পর। মাথায় গ্রামবাংলার কুসংস্কারের এক নবলব্ধ তালিকা। মনে উৎস মানুষের বংশীধ্বনি। ভাবছি ঐ লম্বাটে ঘরে হানা দেব। সিঁথিপাড়ার বাবলুবাবুর (দাস, অকালপ্রয়াত, খুব নিবেদিতবান্ধব ছিলেন কাগজের) চশমার দোকানে গিয়ে দেখি ‘উৎস মানুষ’-এর সব না-পড়া সংখ্যা টেবিলে সাজানো। সেটা ১৯৮৫ সাল। পাড়ার ছেলেরা দলবেঁধে ওখানে আড্ডায় বসে। দেখলাম অনেকেরই ‘উৎস মানুষ’ পড়া। ঐ বাবলুবাবু আমার লেখা নিয়ে কার মারফতে কোথায় পাঠালো জানি না। সপ্তাখানেকের মধ্যেই অশোকবাবুর চিরকুটে অনুরোধ— একটু দেখা করবেন। দেখি আমার লেখাটি তিনটি হাত ঘুরেছে। প্রত্যেকেই সংক্ষিপ্ত ও খোলাখুলি অভিমত মার্জিনে লিখেছেন। সেই লেখা নির্ভুলভাবে সুসম্পাদিত হয়ে বেরোল পরের সংখ্যাতেই। সে রকম পারঙ্গম, সতর্ক, নিরপেক্ষ ও সুবিবেচিত সম্পাদনা আজকাল দুর্লভ। অশোকের সঙ্গে পরিচয় হল তারপর। আরও অনেকের সঙ্গেই। সে পরিচয় বন্ধুত্বের নিবিড়তায় পৌঁছেছিল পরে। প্রথম দিন আলাপের পর হেঁটে হেঁটে ঐ উৎস মানুষীদের সঙ্গে এলাম বড়রাস্তার মোড়। তারপরেও তাঁরা হেঁটেছেন বহুকাল। সেকালের ভাবনার জগতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিতে পেরেছিলেন। প্রায় অর্ধশতক বিজ্ঞানব্রতীর দল গড়ে উঠল বাংলার আনাচে-কানাচে তাঁদের প্রণোদনায়। গাঁয়ের বিজ্ঞানকর্মী ও বসুবিজ্ঞান মন্দির বা নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান শিক্ষকেরা একই মাদুরে বসলেন বহুবার। ঐ প্রজন্মের বহু জাগ্রতচিন্ত এখন বাহাতুরে হয়েও নানা প্রতিষ্ঠানে সেই অগ্নিকণা জাগিয়ে রেখে আরেকটি পঁচিশবছরী দলের অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষায় পথ চেয়ে আছেন।

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

প্রাথমিকভাবে আমরা একটা তালিকা পেশ করছি।

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো, হুগলি
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো, হুগলি
তিতুরাম গাঙ্গুলী	৫৫	৭০	চিত্রশালী, হুগলি
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়ি, হুগলি
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটা, হুগলি
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুন্ডিয়া, হুগলি
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ, হুগলি
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিদ্যাবতীপুর, হুগলি
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুর, হুগলি
নীলমণি গাঙ্গুলী	৩	৪৮	জনাই, হুগলি
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২১	জনাই, হুগলি



এটি একটি দীর্ঘ তালিকার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছিল ১৮৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দে ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ নামের এক বইয়ের প্রথম খণ্ড লেখার জন্য। বইয়ের লেখক: শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

তালিকাটি সে সময়ের হিন্দু সমাজের এক গভীর অসুখ তুলে ধরেছে। তথাকথিত কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের মহিলাদের এক কষ্টকর চিত্র! অন্যান্য বর্ণের মহিলাদের অবস্থা কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। মনে রাখতে হবে, ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ সামাজিক ব্যবস্থায় অন্য বর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণদের থেকে অনেকটা নীচেই অবস্থান করতেন, ছুত-অচ্ছুতের বাতাবরণে সমাজ চালিত হতো। (অবশ্য এখনও অবস্থাটা খুব বদলেছে এমন নয়! প্রায়ই খবরের কাগজে তথাকথিত অন্তর্জের ওপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার চোখে পড়ে।) এই কুলীন ব্রাহ্মণেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক— সব ক্ষেত্রেই উচ্চাসনে থাকতেন। প্রশ্ন হতে পারে, কুলীন ব্রাহ্মণ বলতে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বোঝানো হচ্ছে? এর উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগরমশাই বিভিন্ন শাস্ত্র খেঁটে এক দীর্ঘ ইতিহাস উপস্থিত

করেছেন। রাজা আদিশূর ৯৯৯ শকাব্দে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণদের অপারগতার কারণে কান্যকুব্জরাজের কাছে শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত ব্রাহ্মণ চান। কান্যকুব্জরাজ পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ পাঠান: ১) শাণ্ডিল্য গোত্র— ভট্টনারায়ণ, ২) কাশ্যপ গোত্র— দক্ষ, ৩) বাৎস্য গোত্র— ছান্দোড়, ৪) ভরদ্বাজ গোত্র— শ্রীহর্ষ এবং ৫) সাবর্ণ গোত্র— বেদগর্ভ। তা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরে অর্থাৎ রাজমহিষী পুত্রবতী হওয়ার পর রাজমশাই এই পাঁচ ব্রাহ্মণকে পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম— এই পাঁচগ্রামে থাকতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে তাঁরা এই পাঁচগ্রামে থাকতে শুরু করেন এবং তাঁদের সন্তানসন্ততির কুলীন ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রত্যেক সন্তানসন্ততিকে রাজা বসবাসের জন্য আবার গ্রামদান করেন। সেই গ্রামের নামানুসারে তাঁরা এবং তাঁদের সন্তানসন্ততি পরম্পরা অমুক গ্রামীণ বা অমুক গাঁই নামে পরিচিত হলেন। যেমন, শাণ্ডিল্য

গোত্রের বন্দ্য, ঘোষলী, বটব্যাল, কেশরী— এই ধরনের ষোল গাঁই; কাশ্যপ গোত্রে চট্ট, পালধি, পাকড়সী, ভট্ট— এই ধরনের ষোল গাঁই; বাৎস্যগোত্রে পুতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল ইত্যাদি আট গাঁই; ভরদ্বাজ গোত্রে মুখুটা, সাহরী ইত্যাদি চার গাঁই; সাবর্ণ গোত্রে গাঙ্গুলি, পুংসিক, ঘণ্টেশ্বরী— এই ধরনের বারো গাঁই। বর্তমানে সেটাই ব্রাহ্মণদের পদবিতে পরিণত হয়েছে।

এই পাঁচ ব্রাহ্মণ আসার আগে এ দেশে সাতশো ঘর ব্রাহ্মণ বাস করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা হয়ে প্রতিপন্ন হলেন এবং সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ হলেন। এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ওই পাঁচ ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো সম্পর্ক স্থাপন হোত না। (খেয়াল করুন, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অন্তর্জ আছে!)

আদিশূর বংশ লোপ পাওয়ার পর সেনবংশীয় রাজারা বাংলা শাসন করতে থাকেন। এবং বল্লাল সেনের আমলে কৌলীন্য মর্যাদা নতুনভাবে স্থির করা হয়। সন্তানপরম্পরার মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিদ্যালোপ ও আচারবিলোপ হওয়ায় কৌলীন্যপ্রথার নতুন সংজ্ঞা তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়ল। রাজা কৌলীন্য প্রবর্তন করার জন্য নটা গুণের কথা বললেন: আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা এবং দান। এই সব গুণের মধ্যে একটি গুণের একটু বিস্তৃতির প্রয়োজন আছে। অবশ্য এই বিস্তার বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বইয়েই লিখেছেন। তাঁর কথায়: ‘আবৃত্তি শব্দের অর্থ পরিবর্ত। পরিবর্ত চারি প্রকার—

আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা। আদান, অর্থাৎ, সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ; প্রদান, অর্থাৎ, সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান; কুশত্যাগ, অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ, উভয়পক্ষে কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে, বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদান।... কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুললক্ষণক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত, কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা হয়।’ কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপনের পর বল্লাল সেন একদল ব্রাহ্মণকে ‘ঘটক’ উপাধি দিলেন। এঁদের কাজ হল, কুলীনদের স্মৃতি ও বংশাবলী বলা এবং কৌলীন্যের গুণ ও দোষের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য স্থাপনের দিন স্থির করে ব্রাহ্মণদের নিত্যক্রিয়া সমাপন করে রাজসভায় আসতে বললেন। সেই আদেশ অনুসারে কোনো ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কেউ দেড় প্রহরে, কেউ দ্বিপ্রহরে, কেউ বা আড়াই প্রহরের সময় এসে উপস্থিত হলেন। (রাজার আদেশ! সেটা মানতেই আড়াই প্রহর! সময় সম্পর্কে কি অদ্ভুত নিস্পৃহতা!) এবার রাজার পালা! যে ব্রাহ্মণরা আড়াই প্রহরে এসে উপস্থিত, তাঁরাই ‘কুলীন’!— এটাই রাজার রায়! যুক্তি হিসাবে বললেন, প্রকৃত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আচারক্রিয়া করতে বেশি সময় লাগে! আর অন্যান্যরা পরিচিত হলেন গৌন কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয়— এই নামে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হোল— কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী। ভাবুন অবস্থা!



পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের এই গুণগুলো আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকল এবং বিভিন্ন দোষ প্রকাশিত হতে থাকল। এই সময় ঘটকবিশারদ দেবীবর কুলীন ব্রাহ্মণদের দোষ অনুযায়ী পৃথক সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। যে সব কুলীনের এক ধরনের দোষ ঘটেছে তাঁরা এক সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন বা মেলবন্ধন ঘটানো হোল। ঘটনা হল, কুলীনদের আটঘর যে বিবাহ প্রচলন ছিল, যাকে ‘সর্বদ্বারী বিবাহ’ বলা হত, তাতে আদান-প্রদানের কোনো অসুবিধা হত না এবং কুলীন কন্যার সারাজীবন কুমারী অবস্থায় থাকলেও কোনো

অসুবিধা হত না অথবা একজনকে অকারণে একাধিক বিবাহ করার প্রয়োজনও পড়ত না। কিন্তু পরবর্তীকালে অল্প ঘরের মধ্যে মেলবন্ধন হওয়াতে, কুলরক্ষার জন্য একপায়ে অনেক কন্যাদান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। দেবীবর প্রবর্তিত মেলবন্ধন কৌলীন্যপ্রথা থেকেই বহুবিবাহ প্রথার সূত্রপাত হয়। এই বহুবিবাহের বিপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা শুরু হয় পত্রপত্রিকায় আলোচনার ভেতর দিয়ে। অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচালনায় ১৮৪২ সালে প্রকাশিত ‘বিদ্যাদর্শন’ পত্রিকা প্রথম উদ্যোগ নেয়। এই পত্রিকায় কুলীনদের উদ্দেশে লেখা হয়, ‘হে কুলীন ভ্রাতাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধিপূর্বক আপনাদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাচ আপনারা যে কি গুণ্ড মন্দের আশ্বাদবশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে

প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর।’ ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কালীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সূহৃদ সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। কার্যনির্বাহক সমিতিতে অক্ষয়কুমার দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র— এইরকম বারোজন সভ্য ছিলেন। ওই সভায় কিশোরীচাঁদ এবং অক্ষয়কুমার— এই দুই সম্পাদক প্রস্তাব করেন যে, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ প্রচলন রোধের জন্য সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হোক। এই সভার ১৮৫৭ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, সমাজসংস্কারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচিত হয়েছিল এবং সংস্কারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিও নেওয়া হয়েছিল। ‘১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই সভা বহুবিবাহ নিবারণের নিমিত্ত ‘ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায়’ সর্বপ্রথম আবেদন প্রেরণ করে।’ সরকারি আইন-প্রণয়নের সাহায্যে বহুবিবাহপ্রথা-নিবারণ আন্দোলনের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। এই আবেদনে কোনো কাজ না হওয়ায় ১৮৫৭ সালেও আরো যুক্তিপূর্ণ একটা আবেদন পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে পক্ষে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আবেদন করেছিলেন। যেমন, ১৮৫৫-র ২৭ ডিসেম্বর বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর সরকারের কাছে বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের আবেদন করেছিলেন। এছাড়াও নদীয়ার রাজা, দিনাজপুরের রাজা, কলকাতা, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, ময়মনসিংহ, রাজশাহি প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের আবেদন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ বইতে লেখেন, ‘বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ জন্য, আবেদনপত্র প্রদান বিষয়ে, যাঁহারা প্রধান উদ্যোগী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে, তাঁহাদের উপর এই অপবাদ প্রবর্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা নামকিনিবার জন্য, দেশের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিংশতি সহস্রের অধিক লোক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে এত নির্বোধ ও এত অপদার্থ নহেন, যে এককালে সদসন্ধিবেচনাশূন্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামক্রয়বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন।’ বাংলার লেফট্যান্যান্ট গভর্নরের রিপোর্টেও এইসব দরখাস্তের উল্লেখ আছে। যেমন, ১৮৬৩ সালের একটা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ‘প্রজাদের প্রয়োজনে একটা আইন তৈরীর জন্য এই সব দরখাস্ত কেবল যে অগুণতি তাই নয়, এখানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের কিছু বিশিষ্ট হিন্দু পরিবারেরও স্বাক্ষর আছে। দরখাস্তকারীরা, বর্ধমান, নদীয়ার, দিনাজপুর এবং নাটোরের

রাজন্যবর্গ; এছাড়াও আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এই তথ্য প্রমাণ করে হিন্দু বিদ্যোজ্ঞদের এক বিরাট অংশ হিন্দু বহুবিবাহ রোধের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন।’ ১৮৭৪ সালের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রেকর্ডেও দেখা যাচ্ছে, ‘বিবিধ কাজকর্মের মধ্যে যেটা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে, হিন্দু বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে চারটে বিতর্কিত কাজ হয়েছে, যার লেখকরা হচ্ছেন একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর অন্যদিকে হিন্দু অধ্যাপকগণ।’

এই আবেদনের বিপক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে ১৬৩৮ জনের স্বাক্ষর নিয়ে একটি আবেদন করেন। আবেদনের শেষ লাইনটি এইরকম, ‘কুলীনদের বহুবিবাহের যা কিছু খারাপ বলে ভাবা হচ্ছে, আপনার দরখাস্তকারীরা আশঙ্কা করছে যে মহামান্য কাউন্সিল, প্রজাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না, বা সাধারণভাবে, হিন্দু বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না; একই সময়ে মুসলিমদের বহুবিবাহ বাতিল না করে হিন্দুদের বহুবিবাহ বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করা ভালো নয়; কাজেই হিন্দু ও মুসলিমদের বহুবিবাহ একসাথে এখন বাতিল করা যায় কিনা কাউন্সিল সেটা বিবেচনা করুক।’

আইন করে বহুবিবাহ রোধ করার বিষয়টি অনেকের কাছেই ভালো লাগছিল না। ১৭৭৭ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বহুবিবাহ’ নামের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখক লেখেন, ‘এমত ভয়ানক কুপদ্ধতি এই দণ্ডেই দেশ হইতে দূর করা বিধেয় কি না? রাজনিয়ম রাজদণ্ড প্রভৃতি এ কুপদ্ধতি নিবারণ করিবার অনেকানেক উপায় আছে বটে, কিন্তু তদ্বারা নিবারিত হইলে আমাদের দেশের আর কি মহত্ত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল?... ইহা রহিত করা কিছু বহু আয়াস কিছু বহুব্যয় সাধ্য নহে, কেবল পরস্পর আপনারা সকলে মনোযোগী হইলেই এইক্ষেণে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যাইতে পারে।’

কোনো প্রথা যখন দৃঢ়ভাবে সামাজিক অবস্থায় প্রবেশ করে, তখন সেটা উচ্ছেদের জন্য সরকারি আদেশনামার প্রয়োজন হয়। জনগণের শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে কোনো একদিন এই কুপ্রথা দূরীভূত হবে, এই আশায় নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। দেখা গেছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কার রাজনিয়মের সাহায্যেই সাধিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগররা এই কথা বুঝেছিলেন এবং বিধবা বিবাহের মতোই বহুবিবাহ প্রথা রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্য নিয়ে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন।

১৮৬৩ সালে আবেদনপত্র ছোটলাট সিসিল বিডনের হাতে দেওয়া হয়। উনি বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথাকে কোনো আইন পাশ করে উচ্ছেদ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে

চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৮৬৬-র ৫ এপ্রিল বাংলা সরকার ভারত সরকারকে বহুবিবাহ-নিবর্তক আইন-প্রণয়নের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করে যা নিবেদন করে সেটা এই রকম: ...সমস্যাটা সারা ভারতের নাকি শুধুমাত্র বাংলাদেশের, এই নিয়ে মতভেদ হওয়াতে বিলটি উত্থাপন করা যায় নি। যদিও এই ধরনের সামাজিক প্রথা সংক্রান্ত আইন কেবল একটি মাত্র প্রদেশের জন্য পাশ করার অনেক সুবিধা আছে, বাংলাদেশে এই কুপ্রথা এত বেশি যে, কেবল বাংলার জন্য ভারত সরকারের কিছু করা কর্তব্য বলে মনে হয়।...’ কিন্তু ভারত সরকার এই আবেদন গ্রহণ করেননি। বাংলা-সরকারকে ১৮৬৬ সালের ৮ আগস্ট তারা একটা চিঠি লেখে: ‘ভারত সরকার একথা স্বীকার করে যে, বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে বহুবিবাহের স্বেচ্ছাচারিতা যে কোনো উপায়ে বন্ধ করতে চান এবং তাঁদের এই সিদ্ধির প্রতি ভারত সরকারেরও সহানুভূতি আছে। কিন্তু ভারত সরকার মনে করে না যে, সেখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ, এমনকি শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা বহুবিবাহ রদ সমর্থন করেন।... এই প্রসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার, বহুবিবাহপ্রথা ভারতের একটি সামাজিক ও ধর্মীয় ‘ইনস্টিটিউশন’ এবং এখনও তাতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার সময় আসে নি।...’

অর্থাৎ, সোজা কথায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম। সাধারণত তাঁরা ব্রাহ্মণদের দেবতার পরবর্তী স্থানেই রাখতেন। আর ধর্মের মোড়কে থাকায় কালো কে সাদা বলতে এবং করতে ব্রাহ্মণদের বিশেষ খাটতে হাত বলে মনে হয় না। শিক্ষিত এবং ধনবান যে ক্ষুদ্র অংশ বিষয়টার ভালো এবং মন্দ বুঝতেন, তাঁদের মধ্যেও ভাগ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, এই কারণেই ইংরেজদের রাজধর্ম পালনে অপারগতা ছিল। বাংলা সরকার এই চিঠির পরেও বহুবিবাহপ্রথা সম্বন্ধে সামাজিকভাবে অনুসন্ধানের জন্য সাত সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই সাতজন সদস্য হলেন— সি পি হভহাউস, এইচ টি প্রিন্সেপ, সত্যসরণ ঘোষাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র। কমিটির রিপোর্টে কিন্তু বিদ্যাসাগররা ‘সাধারণের বোধ জাগ্রত হলে এই স্বেচ্ছাচারিতা কমবে’— এই ধরনের একটা মন্তব্য করে সমস্যাটির পাশ কাটিয়ে যান।

সমস্যাটি যে কত গভীর সেটা বোঝার জন্য আমরা আরেকটি তালিকা পেশ করছি। তালিকাটি ১৯০৩ সালের ‘প্রবাসী’

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে হিন্দুবিধবার তালিকা

বয়স কত বৎসর	বিধবাদের সংখ্যা
০ - ১	৪৩৩
১ - ২	৫৭৬
২ - ৩	৬৫১
৩ - ৪	১৭৫৬
৪ - ৫	৩৮৬১
৫ - ১০	৩৪৭০৫
১০ - ১৫	৭৫৫৯০
১৫ - ২০	১৪২৮৭১
৬০ ও তদূর্ধ্ব	১৩৩৭১১৯

আশা করি, এর পর বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ নিয়ে আমাদের ভাবনার আর কোনো অবকাশ নেই। তবে স্বাধীন ভারতে ‘হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৫’ নামে একটি আইন তৈরি হয়। সেখানে কিন্তু হিন্দু বহুবিবাহকে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র, বিদ্যাসাগরদের যে বিষয় নিয়ে আন্দোলন এবং যেভাবে এই কুপ্রথা রোধ করতে চেয়েছিলেন, একশো বছর পরে সেই প্রথা কিছুটা হলেও রোধ করা গেছে। কিছুটা বলছি, কারণ বর্তমান সময়েও অনেকেই একাধিক স্ত্রী বর্তমান (একজন আইনি, অন্যরা বেআইনি)— বিশেষ করে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের পরিবারের ক্ষেত্রে।

সহযোগী গ্রন্থ

- ১) বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড (মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ১৯৬৯)
- ২) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, বিনয় ঘোষ (ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা ২০১১)
- ৩) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র (আনন্দ, কলকাতা ২০১৯)

উ মা

উৎস মানুষ-এর নতুন বই
স্বাস্থ্যের সাতকাহন
ডাঃ গৌতম মিস্ত্রী

ভূয়ো খবর, খবরে ভূয়োদর্শন

অর্ক বৈরাগ্য

ভূমিকা

শতাব্দীর রয়্যাল সোসাইটি বিজ্ঞানের অন্যতম এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ১৬৬০ সালে প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম জন এডলিন সোসাইটির লক্ষ্য (motto) হিসেবে বেছে নেন গ্রিক দার্শনিক হোরেসের একটি উক্তি: ‘নালিয়াস ইন ভার্ভা’, অর্থাৎ ‘কারও কথায় নয়’ বা কোনো ব্যক্তি বলেছে বলে নয়, প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে নিজে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখে তবে সিদ্ধান্ত নাও। সেই সময় থেকে আজও বিজ্ঞানীদের কাছে, সত্যের অনুসন্ধানীদের কাছে এটিই প্রাথমিক পাঠ হিসেবে চলে আসছে। বস্তুত, আজকের ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই পাঠ বিজ্ঞানীদের ছাড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী আমাদের সকলের কাছেই সমান শিক্ষণীয়।

কাকে বলব ফেক নিউজ?

যে সমস্ত খবর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যা বা আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যার মিশ্রণে পরিবেশন করা হয় তাকে ফেক নিউজ বলা যেতে পারে। এরই কাছাকাছি কিছু শব্দ হল ‘রিউমার’ বা গুজব, ভুল খবর, ছাপার ভুল ইত্যাদি। সাধারণত, এগুলোর সঙ্গে ফেক নিউজের তফাত হল— ফেক নিউজ দেখতে অনেকটা টু নিউজ বা সত্যি খবরের মতোই। তাতে একটি শিরোনাম বা হেড লাইন থাকে, একজন লেখক বা লেখিকার নাম থাকে, সময়, তারিখ উল্লেখ থাকে, কিছু ছবি থাকতে পারে এবং একটি মিডিয়া হাউস বা তাদের খবরের কাগজ/টিভি চ্যানেল/নিউজ পোর্টালের নাম থাকে। তাই সহজে একে আলাদা করা মুশকিল। অন্যদিকে গুজবের ক্ষেত্রে এতটা নির্দিষ্ট অবয়ব থাকে না। একটি ঘটনা বা বক্তব্যকে কিছুটা আবেগ মিশিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ছোট লেখার মাধ্যমে, যার সঙ্গে একটি ভিডিও বা অডিও ক্লিপ (অবশ্যই ভূয়ো) জুড়ে দেওয়া থাকে।

২০১৮-র মার্চ মাসে বিখ্যাত ‘সায়েন্স’ পত্রিকায় ভোসুগি, রয় ও আরাল— এই তিন সমাজতাত্ত্বিক একটি যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন— ‘দ্য স্প্রেড অভ টু অ্যান্ড ফলস নিউজ অনলাইন’। যেখানে তাঁরা ফেক নিউজ শব্দটির পরিবর্তে সত্য আর মিথ্যা খবরের কথা বলেছেন। কেননা, ‘রাজনীতিকরা

তাঁদের মতাদর্শের বিরোধিতা করা যে কোনো খবরকেই ফেক নিউজ বলে থাকেন এবং তাঁদের পক্ষে/সমর্থনে প্রচারিত যে কোনো খবরকেই ঠিক (ফেক নয়) বলে থাকেন। তাই গবেষণা তথা তাত্ত্বিক চর্চার পরিসরে ফেক নিউজ কথাটি অর্থ হারিয়েছে।’

ফেক নিউজের সেকাল ও একাল

ইন্টারনেট বিপ্লবের আগে যখন কতিপয় নিউজ এজেন্সি ছিল (সরকারি ও বেসরকারি) তখনও ফেক নিউজ ছড়িয়েছে। তবে মান এতটাই খারাপ ছিল, তাদের চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হত না। যেমন— হিলারি ক্লিন্টন ভিন গ্রহের প্রাণী দত্তক নিয়েছেন। বর্তমানে যখন সবার কাছে স্মার্ট ফোন আর স্ক্রলমুল্যে হাই স্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা রয়েছে, তখন ফেক নিউজের পরিসর



অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। বিভিন্ন অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া এখন ফেক নিউজের একটি বড় আধার। যেমন: ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, নানান অনলাইন নিউজ পোর্টাল। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমগুলিও অনেক সময়েই রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ছে এবং নানা সময়ে তাদের কাছ থেকেও ফেক নিউজ তৈরি হচ্ছে ও ছড়াচ্ছে।

ফেক নিউজের রকমফের

ভোসুগিরা দেখিয়েছেন, যত রকমের ফেক নিউজ আছে তার বেশিরভাগ অংশ দখল করে আছে রাজনৈতিক ফেক নিউজ; এরপরেই যথাক্রমে শহুরে কিংবদন্তি, অর্থনীতি ও ব্যবসা সংক্রান্ত, সম্ভ্রাসবাদ ও যুদ্ধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিনোদন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ফেক নিউজ। তবে এই রকমভেদের ক্রম দেশ ও কাল ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

কে বা কারা তৈরি করে ফেক নিউজ? কেন করে?

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, কোনো রাজনৈতিক দল, ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কম্পিউটার অ্যালগোরিদম ফেক নিউজ তৈরি করে ও ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা তারা শুরু করলেও ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী আমি-আপনিই দায়ী সেটিকে আরও বেশি বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।

ফেক নিউজ তৈরির প্রয়োজন পড়ে কোনো রাজনৈতিক দলের নিজস্ব জনমত ও জনসমর্থন পেতে তথা বিরুদ্ধ, ভিন্ন রাজনীতির, ভিন্ন ধর্মের প্রতি জনমানসে ঘৃণা ও বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে। অনেক সময় কেবলমাত্র ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি তথা সাইবার-ব্যবসার জন্যেও ফেক নিউজ তৈরি করা হয়।

ক্লিক বেইট: একটি ভাল উদাহরণ। এখানে খবরটিকে এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাতে ইন্টারনেট ইউজার সেটিতে ক্লিক করতে বাধ্য হয়। (ছবি)

Man Tries to Hug a Wild Lion, You Won't Believe What Happens Next!

EARTH FROM — 1428 COMMENTS



ফেক নিউজ কীভাবে ছড়ায়?

ভোসুগিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে দেখেছেন, ২০০৬-১৬ সাল পর্যন্ত টুইটারে কীভাবে ফেক নিউজ/ মিথ্যা (ফল্‌স) খবর ছড়িয়েছে। তাঁরা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছেন, মিথ্যে খবর, সত্য খবরের তুলনায় অনেকগুণ বেশি পরিমাণে, অনেক দ্রুত, অনেক দিন ধরে, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এখানে প্রতিটা বিশেষণ গুরুত্বপূর্ণ। সত্য খবর ছড়ায় ধীরে ধীরে আর মিথ্যে অত্যন্ত দ্রুত। আগুনের মতো। কিন্তু কেন?

যাঁরা মিথ্যে খবর ছড়ান, তাঁরা কি তবে বেশি সংখ্যায় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন? তাঁরা কি বেশি দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন? তাঁরা কি বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক ফলোয়ার আছে? আপাতভাবে এগুলিই সম্ভাব্য উত্তর বলে যদি আপনি মনে করেন, তবে ভুল করছেন। কারণ প্রকৃত ঘটনাটি সম্পূর্ণ উল্টো। আর এই ফলাফলে

আপনার মতোই গবেষকেরাও আশ্চর্য হয়েছেন।

এর উত্তর রয়েছে গবেষণাটির পরবর্তী ধাপে। তাঁরা ইনফর্মেশন থিওরি এবং বেইসিয়ান ডিসিশন থিওরির সাহায্যে দেখিয়েছেন— যে কোনো রকমের ‘নতুনত্ব’ মানুষের মনকে প্রভাবিত করে এবং তাকে আকর্ষিত করে; তাকে সিদ্ধান্ত নিতে ও সেই ‘নতুন’ তথ্য সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রলোভিত করে, উৎসাহিত করে। এই ব্যাখ্যাকেই তাঁরা নাম দিয়েছেন ‘নভেলটি হাইপোথিসিস’, বাংলায় বললে ‘নতুনত্ব প্রকল্প’। তাঁরা আরো বলেছেন, ‘এই নতুন তথ্য যেন আমাদের চারপাশটাকে আরো ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করে। নতুন তথ্য শুধুমাত্র আশ্চর্য করে তাই নয়, তথ্য তত্ত্ব অনুযায়ী এ যেন আমাদের আরো ভালো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, এবং তার সঙ্গে সামাজিকভাবেও যেন আমাদের একটু উচ্চতায় স্থান দেয়; কেননা আমরা তখন অনুভব করি, ঘটনাটির ‘ভিতরের খবরটি’ যেন আমি জেনে ফেললাম!’ ভোসুগিরা এখানেই থেমে থাকেন নি, আরও একধাপ এগিয়ে দেখতে চেয়েছেন, এই নতুনত্বের আড়ালে থাকা সত্য বা মিথ্যে খবরগুলিতে মানুষ কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, তাদের আবেগ কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক রবার্ট পল্টিকের ‘হুইল অভ ইমোশন’-কে ব্যবহার করে তাঁরা দেখেছেন, নতুনত্বের আড়ালে থাকা মিথ্যে খবরের প্রতি মানুষের ‘বিস্ময়’ (সারপ্রাইজ) এবং বিতৃষ্ণা/বীতশ্রদ্ধা (ডিসগাস্ট) বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে, নতুনত্বের আড়ালে থাকা সত্য খবরের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা, আনন্দ, বিশ্বাস ও বিষমতা বেশি করে ফুটে উঠেছে। সবমিলিয়ে ‘নতুনত্ব মেশানো খবর, যা আমাদের মনে বিস্ময় বা বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের আড়ালেই ফেক নিউজ ছড়িয়ে যায়।

কেন আমরা ফেক নিউজের কবলে পড়ি?

অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, গত ১০-১৫ বছরে ধীরে ধীরে বিপুল সংখ্যক মানুষের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা এবং সমান্তরালভাবে বিরাট সংখ্যায় ফেক নিউজ ও তাদের প্রস্তুতকারক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। কিন্তু এ তো গেল উৎসস্থলের সমস্যা। বাস্তবে এর থেকেও বড় কারণটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেক নিউজকে গ্রহণ করা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার। যাঁরা ফেক নিউজ পড়েন, ‘লাইক’ করেন, ‘কমেন্ট’ করেন, ‘শেয়ার’ করেন। আরও দেখা গেছে, তথ্য দিয়ে অনেক সময় কোনো ফেক নিউজের অসারতা প্রমাণ করে দেওয়ার পরেও অনেকে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। কিন্তু কেন? উত্তর রয়েছে বিবর্তনে।

মানুষ একটি সামাজিক জীব। বেঁচে থাকা ও অপত্য সৃষ্টির প্রয়োজনেই তাকে মেনে চলতে হয় যুথবদ্ধ জীবন। এই প্রক্রিয়া তার সহজাত। সে সবসময় প্রস্তুত থাকতে চায় অনাগত বিপদের

জন্যে, প্রাণহানি থেকে রক্ষা পেতে। তাই সে ভরসা করে অন্যের এনে দেওয়া নতুন খবরের ওপর, তথ্যের ওপর, যার ওপর দাঁড়িয়ে সে আরো ভালো সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়াসী হয়।

কেন না, প্রতিটা তথ্য নিজে, ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করার মধ্যে রয়েছে মানসিক ও শারীরিক শ্রমের ব্যয়, সময়ের অপচয়, অচেনা-অজানা পথে হারিয়ে যাওয়ার ভয়। এই প্রবণতা বহু আগে থেকেই আমাদের জিনে লিখিত।

মুশকিল হল, আমাদের জৈবিক বিবর্তন হয় লক্ষ বছর ধরে। তাই স্রেফ বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু অতি পুরোনো প্রবৃত্তিও এখনও আমাদের মধ্যে জোরালোভাবে রয়ে গেছে; অথচ আমাদের বিজ্ঞান, বিশেষ করে প্রযুক্তিগত বিবর্তন অত্যন্ত কম সময়ে আমাদের ছাপিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যটিই আমাদের সমস্যায় ফেলে; আমরাও প্রবৃত্তিগত কারণে ভুল করে ফেলি, যে প্রবৃত্তিই একসময় যাযাবর মানুষকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। এই ধরনের প্রবৃত্তিগুলোকেই মোটামুটি একসঙ্গে ‘কগনিটিভ বায়াস’ বলা যেতে পারে।

বর্তমান সময়ে কগনিটিভ বায়াস আমাদের মনের শর্ট-কাট হিসেবে কাজ করে। অনেক মানসিক হিসেব-নিকেশ কগনিটিভ বায়াসের ওপর ভর করে স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটিক) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়ে যায়, ফলে দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমাদের মানসিকশ্রম ব্যয় অনেকখানি কম হয়ে যায়।

এই জায়গাতেই কগনিটিভ বায়াসের দুর্বলতার সুযোগ নেয় ফেক নিউজ। মূলত পাঁচ ধরনের কগনিটিভ বায়াস আমাদের ফেক নিউজের প্রতি সন্দেহকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

১। খবরের গভীরে/ বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে দ্রুত কেবল ‘হেড লাইনে’ চোখ বুলিয়ে নেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেষার করে দেওয়া।

২। ব্যান্ড ওয়াগন এফেক্ট: এতজন লোক যখন বলছে (লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করছে) তাহলে এটি ভুল/ মিথ্যা হতে পারে না।

৩। কনফার্মেশন বায়াস: যে খবর আমার মতামতের সঙ্গে মিলছে, আমার বিশ্বাস, (ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, পরাবিজ্ঞান) বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলছে— তা সত্য খবর বলে ধরে নেওয়া। অন্যদিকে যা মিলছে না, যেটি আমার বিশ্বাস বা ধারণাকে আঘাত দিচ্ছে, তাকে মিথ্যে খবরের তকমা দেওয়া।

৪। মোমোরি বায়াস: যে খবর আমাকে নাড়া দিয়েছিল, এমন কিছু আবেগের জন্ম দিয়েছিল, যেগুলো সহজে ভোলার নয়, (যেমন: রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ) সেগুলিকে ঠিক খবর হিসেবে মনে রাখা আর অন্যগুলি ভুলে যাওয়া। বিশেষত তথ্য, সংখ্যা, গাণিতিক হিসেব, সংখ্যাতত্ত্ব, যুক্তি দিয়ে সাজানো, বেশ বড়, আবেগহীন নৈর্ব্যক্তিক খবর।

৫। হার্ড পার্সন এফেক্ট: যেখানে একজন ব্যক্তি মনে করেন, ফেক নিউজের কবলে বাকিরা পড়েন, তিনি নিজে বিচক্ষণ, তাঁকে কোনো ফেক নিউজ প্রভাবিত করতে পারবে না। সহজ কথায়, বাকিরা ভুল করে, আমি করি না।

যে কোনো ফেক নিউজ প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আমাদের এই পাঁচ ধরনের কগনিটিভ বায়াসকে কাজে লাগিয়েই আমাদের কাছে ফেক নিউজ পৌঁছে দেয়, আর আমরা সহজেই সেগুলিকে বিশ্বাস করে ফেলি।

মিথ্যের সঙ্গে সত্য খবরের তফাত করব কীভাবে?

শুরুর দিকের ফেক খবরগুলি এতটাই সাধারণ তথা নিম্নমানের হত যে, তাদের চিহ্নিত করা তুলনামূলক সহজ ছিল। যত দিন যাচ্ছে, তাদেরও কোয়ালিটি বা গুণগত মানের ‘বিবর্তন’ ঘটে চলেছে এবং ততই তাদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে কারণগুলি হল—

১। মিথ্যে খবরের সঙ্গে খানিক সত্য খবর মিশিয়ে দেওয়া। এর ফলে পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা সহজ হয়ে যায়। এই ধরনের ফেক নিউজে পাঠক আগে থেকেই যে সমস্ত তথ্য বা ঘটনা সত্য বলে জানেন, সেগুলিকে শুরুতেই বলে নেওয়া হয়। তারপর বাকি অংশটায় মিথ্যা মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়।

২। তথ্যকথিত প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যম/ সংস্থাগুলির অতিরিক্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়া এবং ক্রমাগত নিজেরা খবরের সত্যতা যাচাই না করে (প্রকৃতপক্ষে যেটা সংবাদ মাধ্যমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ) ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মিথ্যা খবর পরিবেশন করা ও তাদের ‘ভাইরাল’ করে দেওয়া। এতে করে তাদের ওপর সাধারণ মানুষের ভরসাটাই উঠে গেছে, যার ফলে হয়েছে মারাত্মক। তাদের সম্প্রচারিত খবরকে মানুষ অবিশ্বাস করছে, আর উল্টোদিকে নাম-গোত্রহীন সংবাদে উৎসকে সঠিক বলে স্বীকার করছে।

৩। হাঁসজারু বা বকচ্ছপ যুক্তি: সুকুমার রায়ের ‘খিচুড়ি’ কবিতায় আমরা দেখেছি এই ধরনের অদ্ভুত জীবের উল্লেখ। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল: হাঁস এবং সজারু, বা বক এবং কচ্ছপ এই দুই ধরনের প্রাণীরই অস্তিত্ব আছে এটা ঠিক; কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে। তাদের নামের মধ্যে মিল আছে বলে তাদের জুড়ে দিয়ে একটা নতুন প্রাণীর কথা কল্পনা করলেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না। তাই হাঁসজারু বা বকচ্ছপ বলে কিছু নেই। যুক্তিবিদ্যার এই ধরনের কিছু সাধারণ পাঠ আমাদের শিখতেই হবে, ফেক নিউজের কবলে থেকে বাঁচতে গেলে।

৪। কৃত্রিম মেধা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) ব্যবহার করে, নিতানতুন আবিষ্কৃত কম্পিউটার সফটওয়্যারের সাহায্যে এমন উন্নতমানের ফেক ভিডিও (যেমন: ডিপ ফেক) ফেক অডিও, ফেক ছবি/ ফোটোগ্রাফ তৈরি করা হচ্ছে যেগুলিকে আমাদের সীমিত

মনুষ্য-ইন্দ্রিয় বা চিন্তাভাবনা দ্বারা একেবারেই চিনতে পারা যায় না, তা সত্যি না মিথ্যে।

এবার আসি সরাসরি কিছু পার্থক্যে।

মুশকিল হচ্ছে, বর্তমানে ফেক বা মিথ্যা খবরগুলিকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলায় জন্যে সত্য ও মিথ্যা খবরের এই আপাত সীমারেখাটিকে প্রায়শই গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই

কুসংস্কারের ব্যাপক পরিমাণে প্রচার ও প্রসার ঘটছে।

ফেক নিউজ থেকে প্রতিকার কীভাবে

এর জন্যে ফেক নিউজের উৎস, তার ছড়িয়ে-পড়া আর তাকে গ্রহণ করা— এই তিন জায়গাতেই পরিবর্তন আনতে হবে।

১। ফেক নিউজ তৈরি বন্ধ করার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে একযোগে পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যদলের বিরুদ্ধে মানুষকে

সত্য খবর

১। হেড লাইনের লেখা ও ভিতরে বিস্তারিত লেখার মধ্যে মিল থাকে।

২। একজন লেখক/লেখিকার নাম থাকে, সংবাদ সংস্থার নাম, সময়, তারিখ থাকে।

৩। লেখাটিতে তথ্য বেশি থাকে। যেমন: নির্দিষ্ট স্থান, কাল, পাত্রের উল্লেখ, বিশেষজ্ঞদের মতামত, একই রকম পূর্ব ঘটনার উল্লেখ, সরকারি বক্তব্য।

৪। লেখাটিতে নিষ্ঠুর সঙ্গে কেবল তথ্যের উল্লেখ থাকে। লেখাটি পড়ে কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা পাঠকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

৫। লেখায় তথ্যের উৎস উল্লেখ থাকে। যেমন, ওয়েবসাইট, বই বা পত্রপত্রিকার নাম। এক কথায় ‘রেফারেন্স’।

৬। সাধারণত লেখাটি পাঠককে কোনো বিষয়ে একটি নৈর্ব্যক্তিক তথ্য দেওয়ার জন্যেই লেখা হয়।

মিথ্যা খবর

১। লেখাটির হেড লাইন বা শিরোনাম অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়। যদিও ভিতরের লেখায় সারবস্তা কম থাকে।

২। অনেক সময় এগুলি থাকে না, আর থাকলেও কাল্পনিক হয়। খোঁজ নিলে দেখা যেতে পারে, ওই নামের কোনো ব্যক্তিই নেই।

৩। তথ্য কম থাকে। আবেগী শব্দ অনেক বেশি ব্যবহার হয়। যেমন: ‘একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা’, ‘জেনে অবাক হয়ে যাবেন’, ‘আপনার কি এখনও রাগ হচ্ছে না?’, ‘এ আমরা কোনদিকে যাচ্ছি’, ‘দেশকে ভালোবাসলে অবশ্যই শেয়ার করুন’, ‘এরা কি মানুষ?’ ইত্যাদি।

৪। লেখাটিতে বারবার পাঠককে নির্দেশ দেওয়া হয়, কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তার দেওয়া উচিত। যেমন: ‘এদের বিরুদ্ধে এখনই গর্জে উঠুন’, ‘এদেরকে চিনে নিন’, ‘মুখোশ খুলে গেল’, ‘সবাইকে জানিয়ে দিন’, ‘নিজেকে ও নিজের পরিবার কে সুরক্ষিত রাখুন’, ‘দেশবাসী হিসেবে গর্ব বোধ করুন’ ইত্যাদি।

৫। সাধারণত থাকে না।

৬। লেখাটি বেশি বেশি মানুষের কাছে ভ্রান্ত, মিথ্যা খবর ছড়িয়ে রাজনৈতিক/ ধর্মীয়/ অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে লেখা হয়। তাই এই কথাটি বার বার বলা হয়: সবাইকে শেয়ার করে জানিয়ে দিন, অন্তত ১০টি গ্রুপে ফরোয়ার্ড করুন ইত্যাদি।

তাদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যেমন, টেবিলের ৩ ও ৫ নম্বর পয়েন্টগুলি অনেক সময় মিথ্যা খবরের সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন: কল্পিত স্থান, কাল, পাত্র, বই, পত্রপত্রিকার রেফারেন্স।

ভারতে ফেক নিউজের বর্তমান পরিস্থিতি

ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউবের ব্যবহারকারী ব্যক্তির সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি ও অনেক ক্ষেত্রেই ভারত এই দিক থেকে এক নম্বরে। অন্যদিকে, ভারতে সার্বিক শিক্ষা, সচেতনতা ও বিশেষত ইন্টারনেট লিটারেসি উদ্বেগজনক ভাবে কম। এই দুইয়ের মিশ্রণ হয়েছে মারাত্মক। বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী এই সুযোগে সর্বক্ষণের জন্যে (২৪ x ৭) কিছু ফেক নিউজ প্রস্তুতকারী কেন্দ্র চালাচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তারা প্রতিদিন, একাধিক পরিমাণে ফেক নিউজ ছড়িয়ে চলেছে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হচ্ছে। পাশাপাশি দিনে দিনে জনমানসে অপবিজ্ঞান, অবিজ্ঞান ও

উস্কানি দিয়ে, বিদ্বেষ ছড়ানো রাজনীতির প্রবণতা কমাতে হবে।

২। প্রতিষ্ঠিত পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ-মাধ্যমগুলিকে নিরপেক্ষ হতে হবে, সেইটেই তাদের প্রাথমিক পরিচয়। ‘আমরা খবরের সত্যতা যাচাই করিনি’, এই ধরনের বিপজ্জনক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপ ও মন্তব্য থেক বিরত থাকতে হবে। খবরের সত্যতা যাচাই করাটাই তাদের কাজ, এটা বুঝতে হবে।

৩। সংবাদ-মাধ্যমগুলির একটি করে অন্তত ‘ফ্যাক্ট চেকিং সেল’ রাখতে হবে, যাদের কাজ হবে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়া যে কোনো খবরের সত্যাসত্য যাচাই করা। যাতে সাধারণ মানুষ সেই ওয়েবসাইটে গেলেই আসল খবরটি কী তা জানতে পারেন। আমেরিকান বেশ কিছু সংবাদ সংস্থার এই ধরনের সেল রয়েছে। যেমন, নিউ ইয়র্ক টাইমস, সি এন এন।

৪। যারা সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইউটিউব) ব্যবহার করে কোনো খবর পড়ছেন, তখন তাঁরা উপরে আলোচিত টেবিল থেকে সত্য আর মিথ্যা খবরের বৈশিষ্ট্যগুলি

খেয়াল রাখতে পারেন।

৫। খবর পড়ার সময় মানুষ হিসেবে নিজের কগনিটিভ বায়াসগুলির কথা মাথায় রাখতে পারেন। যে কোনো খবরকেই শুরু থেকেই একটু সন্দেহের চোখে দেখা জরুরি।

৬। হয়তো এগুলো সব সময় সম্ভব নয়। এত সময় থাকে না আমাদের। তাই খবর পড়ার সময় ‘ফ্যাক্ট চেক’ না করলেও অন্তত সেটিকে লাইক, কমেন্ট এবং বিশেষ করে ‘শেয়ার’ করার আগে অবশ্যই ফ্যাক্ট চেক করতে হবে। একই খবর আলাদা আলাদা সোর্স থেকে যাচাই করে দেখতে হবে। একটু গুগল সার্চ করে দেখতে হবে। কোনো বিশেষজ্ঞ পরিচিত থাকলে তাঁকেও জিজ্ঞাস করা যেতে পারে। আমার পরিবারের সদস্য, কাছের বন্ধু বা অফিসের সহকর্মী পাঠিয়েছে মানেই তাকে ঠিক বলে ধরে নেওয়া চলবে না। এটি একদিনে হবে না, অভ্যাস করতে হবে।

৭। বিরুদ্ধ পক্ষের মতামত, তথ্য, যুক্তি ঠাণ্ডা মাথায় শোনার ও তাকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নিজের কনফার্মেশন বায়াসকে ছাড়িয়ে, কন্ফার্ট জোনকে ছাড়িয়ে বারবার অস্বস্তিতে পড়াটা অভ্যাস করতে হবে।

৮। সবশেষে নিজেকে মানবিক দিক থেকে, দার্শনিক দিক থেকে, মূল্যবোধের দিক থেকে, বিজ্ঞানচেতনার দিক থেকে আরও উন্নত আর ভাল মানুষ করার চেষ্টা সারা জীবন চালিয়ে যেতে হবে। দার্শনিক, মানবিক মূল্যবোধ আর বিজ্ঞান চেতনার বিচারে যারা অন্যদের থেকে একটু এগিয়ে থাকেন, ফেক নিউজ তাদের সবচেয়ে কম প্রভাবিত করে।

পরিশেষে

একদিকে ভারতে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা, ফেক নিউজের সংখ্যা পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি। উল্টোদিকে ফেক নিউজ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা, সরকারি নির্দেশনামা ও ফেক নিউজ রোধে আইন ও শাস্তির বিধান খুবই কম। এই দুয়ের মধ্যে একটি হিতকারী সামঞ্জস্য আনতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা, নিম্নমানের রাজনীতি ও অপবিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব বিপদজ্জনকভাবে বাড়বে। সামাজিকস্তরে ফেক নিউজ নিয়ে সচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ফেক নিউজ নিয়ে গবেষণা এই সময়ে আশু প্রয়োজন।

সূত্র

- ১। নালিয়াস ইন ভার্বা: উইকিপিডিয়া
- ২। কগনিটিভ বায়াস: উইকিপিডিয়া
- ৩। দ্য স্প্রেড অফ ট্রু অ্যান্ড ফলস নিউজ অনলাইন: ভোসোগি এট অল, সায়েন্স পত্রিকা, ৯ মার্চ ২০১৮
- ৪। সেন্টার ফর ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স এট ইউ সি সান্টা বারবারা ওয়েবসাইট: ফেক নিউজ
- ৫। ফেক নিউজ ইন ইন্ডিয়া: উইকিপিডিয়া

উ মা

পরিবেশ আন্দোলন

ও পেট্রা কেলি

(জন্ম: ১৯৪৮ – মৃত্যু: অক্টোবর ১৯৯২)

নিরঞ্জন হালদার



বিংশ শতাব্দীর যেসব মহিলা একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের যোগ্যতায়, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে নেত্রী হিসাবে সম্মান অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পেট্রা কেলির নাম প্রথম সারির প্রথমে। বর্তমানে আমাদের দেশে ‘গ্লিন মুভমেন্ট’, হাইকোর্টের ‘গ্লিন বেঞ্চ’ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এই গ্লিন মুভমেন্টের অন্যতম পথকৃৎ হচ্ছেন জার্মানির পেট্রা কেলি। এদেশের সাধারণ মানুষ এই নামটির সঙ্গে অপরিচিত হলেও, পরিবেশ আন্দোলনকারীরা এই নামের সঙ্গে পরিচিত। পেট্রা কেলি স্থাপিত গ্লিন পার্টি প্রথমবার পার্লামেন্টে গিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টির সঙ্গে সরকার গঠন করে। ২০১০ সালে ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেট, সোশ্যাল ডেমোক্রেট এবং গ্লিন পার্টির কোয়ালিশন জার্মান ফেডারেল সরকার গঠন করে। ২০১১ সালে গ্লিন পার্টি জার্মানির কয়েকটি রাজ্যে দক্ষিণপন্থী সরকারের অবসান ঘটিয়ে গ্লিন পার্টির সরকার গঠন করেছিল।

পেট্রা কেলির জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল তাঁর মৃত্যু। ১৯৯২ সালের ২৯ অক্টোবর জার্মান পুলিশ পেট্রা কেলি এবং

তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী এবং প্রেমিক গার্ট বাসশিয়ানের গলিত মৃতদেহ তাঁদের বন শহরের ফ্লাটে দেখতে পায়। কতদিন আগে তাঁদের খুন করা হয়েছিল, হত্যাকারী কে বা কারা, এত বছর পরেও তা জানা যায়নি। তাঁদের মৃত্যু এখনও রহস্যবৃত।

তাঁদের মৃতদেহের পাশে একটি রিভলভার পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশের ব্যাখ্যা ছিল, গার্ট পেট্রাকে গুলি করে নিজে আত্মহত্যা করেন। ন্যাটোর প্রাক্তন জেনারেল গার্ট এক সময়ে অস্ত্র নিয়ে কাজকর্ম করতেন। তাই পুলিশের এমন ধারণা! ঐ খুন ও আত্মহত্যার পুলিশি ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে। কিন্তু যাঁরা পেট্রা কেলি ও গার্ট বাসশিয়ানকে জানতেন, তাঁরা কেউই পুলিশের গল্পো বিশ্বাস করেননি।

পেট্রা কেলিকে হত্যার পর ‘সংবাদ প্রতিদিনে’ আমার একটি লেখা ছাড়া কলকাতার কাগজগুলিতে আর কোনো লেখা ছাপা হয়নি। অথচ পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা সকলেই পেট্রা কেলিকে খুনের সংবাদে মর্মান্বিত হয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে জার্মানির গ্রিন আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে জানেন। তিনি গান্ধী-আদর্শকে ইউরোপে বাস্তবায়িত করার জন্য পরিবেশ আন্দোলনকে বৃহৎ শিল্পসংস্থা, পারমাণবিক শিল্প, অস্ত্র উৎপাদন ও অস্ত্রবিক্রির ব্যবসা এবং মানব অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে ইউরোপীয় শান্তি আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এ ঘটনা এ দেশের অনেকেরই অজানা। প্রেসিডেন্ট রেগানের উদ্যোগে ন্যাটো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মিডিয়াম রেঞ্জের পারমাণবিক মিসাইল বসানো শুরু করলে, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য ইউরোপের শান্তি আন্দোলন জোরদার হয়। গার্ট ন্যাটোর মিসাইল বসানোর নীতির বিরোধিতা করে মিসাইল-বিরোধী শান্তি আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পেট্রা কেলির মতো তিনিও স্মাজ ও ব্যক্তি-জীবনে অহিংস পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হন। এহেন দুই ব্যক্তি বা একে অপরকে খুন করতে বা আত্মহত্যা করতে পারেন না। এটাই তাঁদের গুণমুঞ্জরা ধরে নিয়েছেন।

পেট্রাকে খুনের খবরে আমার গান্ধীজিকে ও তাঁর অনুগামীদের খুনের কথা মনে পড়ে যায়। গান্ধী খুন হয়েছিলেন নাথুরাম গডসের হাতে। গান্ধীর মার্কিন অনুগামী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র খুন হয়েছিলেন আমেরিকার মেমফিস শহরে সাফাইকর্মীদের আন্দোলনে মদত দিতে যাওয়ার পথে। ফিলিপিনের সিনেটার আকুইনো আমেরিকায় স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকার সময়ে অ্যাটর্নবরোর গান্ধী ছবি দেখেন। গান্ধী-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশে স্বৈরাচারী ডিক্টেটর প্রেসিডেন্ট মার্কোসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ফিলিপিনে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ম্যানিলা বিমানবন্দরে বিমান থেকে নামবার আগেই বিমানের সিঁড়ির মুখে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের পাঠানো আততায়ীর

গুলিতে নিহত হন। দিনটি ছিল ১৯৮৩ সালের ২১ আগস্ট। বেনিগ্নো আবুইনোর হত্যার ঘটনা রহস্যবৃত। গান্ধীর জার্মান অনুগামী পেট্রার খুনের রহস্য হয়তো রহস্যই থেকে যাবে। যেমন, জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অর্থনীতিবিদ রোজা লুক্সেমবুর্গ খুন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের হদিস মেলে নি। জার্মান জেলেই রোজা ‘রাশিয়ান রেভোলিউশন’ লেখেন, যে বইটিতে তিনি রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লেনিন ও ট্রটস্কির নিন্দা করেছিলেন।

২

১৯৪৮ সালে বার্লিনে পেট্রার জন্ম হয়। মা জার্মান, বাবা পোলিশ। মায়ের সঙ্গে বাবার বিচ্ছেদ হলে মা এক মার্কিনিকে বিয়ে করেন। পেট্রা মার্কিন বাবার ‘পদবি’ নেন। তাঁর স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা মার্কিন দেশে। পড়াশোনার শেষে জার্মানিতে ফিরে ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান কমিউনিটির সদর দপ্তরে চাকরি নেন। কিছুদিন পরেই ১৯৭২ সালে ন্যাটো ইউরোপের দেশগুলিতে স্কল দূরত্বের মিসাইল বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই মিসাইল বসানোর বিরুদ্ধে শান্তি-আন্দোলন জোরদার হয়। পেট্রা এই আন্দোলনে যুক্ত হন। এজন্য তাঁকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত শান্তি আন্দোলন ‘সমরাস্ত্র বনাম উন্নয়ন’ দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলনকে পরিচালিত করত। কিন্তু পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার তেজস্ক্রিয়তা, পারমাণবিক শিল্প ও পারমাণবিক সাবমেরিন চারিদিকে পারমাণবিক আবর্জনা ছড়িয়ে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মগুলির জীবন বিপন্ন করছে, জল-মাটি ও বাতাস দূষিত করছে। এ বিষয়ে কমিউনিষ্টদের শান্তি আন্দোলন নীরব থাকত। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং সেগুলির তেজস্ক্রিয় আবর্জনা মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনকে কীভাবে বিপন্ন করছে, তা দুই বিবাদমান সুপারপাওয়ার নানা রকম মিথ্যা কথা প্রচার করে সত্যকে চাপা দিতে সচেষ্ট ছিল। পেট্রা জার্মান শান্তি আন্দোলনে পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুতের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে যুক্ত করেন।

মানুষের জীবনযাপনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ মাটি এবং বিশুদ্ধ খাদ্য। বৃহৎ শিল্প ও প্রয়োজন মানুষের জীবনের মতো পরিবেশকেও বিপন্ন করছে। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখার প্রক্ষেপে পেট্রাকে ভাবতে হয়েছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে। ধনতান্ত্রিক, মার্কসবাদী ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রাকৃতিক সম্পদকে কেবল কাঁচামাল হিসাবে স্বীকার করত। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করলে সৃষ্টি হবে নতুন সম্পদ। কার্ল মার্ক্সের ‘ক্যাপিটাল’-এ কেবল শ্রমিককে শোষণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের কথা বলা আছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে নামমাত্র

মূল্যে বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করতে পারলে যে মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়, মার্কসীয় ‘সারপ্লাস ভ্যালু’ তত্ত্বে তা স্বীকৃত নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ যে কেবল বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হাজার হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রাখতে হবে, তা ইউরোপের তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক তত্ত্বে স্থান পায় নি। পেট্রা দেখলেন, ধনতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতি মূলত এক। তফাত কেবল উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা নিয়ে। পেট্রা ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে মস্কো গিয়ে সোভিয়েত নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন-পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন কেন? কেন অন্য বিকল্পের সন্ধান করেননি?

৩

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর গুরুত্বের জন্য পেট্রা গান্ধীর চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন। গ্রিন আন্দোলন প্রথমে ছিল জার্মান শান্তি আন্দোলনের একটি ধারা। জার্মান পরিবেশ আন্দোলনকে প্রভাবিত করার জন্য গ্রিন আন্দোলনের উত্তরণ হয় গ্রিন পার্টির প্রতিষ্ঠায়। পেট্রা ছিলেন জার্মান ‘দ্য গ্রন’ পার্টির এক প্রতিষ্ঠাত্রী। পরবর্তীকালে গ্রিন পার্টি রাজনৈতিক দল হিসাবে জার্মানিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়, পার্লামেন্টের ভিতরে গিয়ে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য। কিন্তু নির্বাচনের পরেই সমস্যা দেখা দিল। দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতারোহণ ঠেকাতে গ্রিন পার্টিকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিতে হয়েছিল। পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানির মিলনের বিরোধিতা করায় ১৯৯১ সালের নির্বাচনে গ্রিন পার্টি পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু ক্ষমতায় না থাকলেও গ্রিন পার্টির প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হয়, তা জানা যায়, পরিবেশদূষণের বিরুদ্ধে নতুন নতুন আইন থেকে। পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য জার্মানি একটি আইন পাস করে। তাতে পরিত্যক্ত আবর্জনার ৭০, ৮০ এমনকি ৯০ শতাংশ পুনরায় ব্যবহার করতে বলা হয়। এই আইনের জন্য ফেলে দেওয়া মোটরগাড়িকে নতুন মোটরগাড়ি তৈরির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করার কারিগরি জ্ঞান অর্জনের জন্য গবেষণা শুরু হয়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পরিবেশের ক্ষতি করে বলে ঐ দুটি রাসায়নিক পণ্যের উৎপাদন হ্রাসের জন্য ঐ দুটি শিল্পে ভর্তুকির পরিমাণ কমানো হয়, যাতে কম ক্ষতিকর সার ও কীটনাশক উৎপাদনের কারিগরি প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে গ্রিন পার্টি পরাজিত হলেও জনগণের মধ্যে ও সরকারি নীতি-নির্ধারণে গ্রিন আন্দোলনের প্রভাব অগ্রাহ্য করার মতো নয়। জার্মানিতে মোটরগাড়ি তৈরির নতুন আইনের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে, বিভিন্ন দেশের মোটরগাড়ির কোম্পানি কেন ভারতে মোটরগাড়ি তৈরি করছে।

পারমাণবিক মিসাইলের বিরুদ্ধে ইউরোপের শান্তি আন্দোলন

যতই শক্তিশালী হয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশে গ্রিন পার্টির আন্দোলনের সুযোগ ততই বাড়তে থাকে। পেট্রা ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে ইকোলজি পার্টির সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সরকার ও রাজনৈতিক দল নয়, জনগণের মতামত নিয়েই সরকারি নীতি স্থির করতে হবে। তাই দেশের মাটিতে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বসাতে দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত ডেনমার্ক ও নরওয়েতে গণভোট নিতে হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকবে কিনা তা নিয়ে সুইডেন ও ডেনমার্ক গণভোট হয় এবং এসব ঘটে অবলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনার অনেক আগে। ইতভার ব্রাটের ‘ভীতির বিরুদ্ধে’ (বাংলা অনুবাদ ‘বোফর্স কেলেঙ্কারি’র অন্তর্ভুক্ত) বই থেকে আমরা জানতে পারি, দুই বিবদমান সামরিক শিবিরের বাইরে সুইডেনে দুই শিবিরে পারমাণবিক অস্ত্র ও মিসাইল পরীক্ষার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও গণ-অবস্থানের সূত্রপাত করে গ্রিন পার্টি। বোফর্স কোম্পানির অস্ত্র উৎপাদনের বিরুদ্ধে কার্লসকোগার বোফর্স কোম্পানির অফিসের সামনে বিক্ষোভের আয়োজন করে গ্রিন পার্টির সদস্যরা। জার্মান গ্রিন পার্টির সদস্যরাও ঐ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অস্ত্র উৎপাদন এবং তৃতীয় বিশ্বের সেই অস্ত্র রপ্তানির বিরুদ্ধে ইউরোপে আন্দোলন শুরু করেন পেট্রা কেলি ও গাট বাসশিয়ান। পরে এটা ইউরোপের শান্তি আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে ১৭০টি আঞ্চলিক যুদ্ধ হয়, তাতে দুই থেকে তিন কোটি লোক মারা যায়। এই যুদ্ধগুলি হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এবং তারা অস্ত্র কিনেছে নগদ টাকায় শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে। বর্তমানে সমস্ত শিল্পগুলির মধ্যে অস্ত্র উৎপাদন শিল্প এবং অস্ত্রের চোরাচালান হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। সুইডেনের বোফর্স কোম্পানি ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ভারতকে বোফর্স কামান বিক্রি করে এবং বোফর্সের অস্ত্রের চোরাচালানে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান গোপনে ঐ বোফর্স কামান পেয়েছিল। গ্রিন পার্টির আন্দোলনের ফলে ইউরোপে একদিকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা সঙ্কুচিত করতে হয়েছে এবং মানবাধিকার ভঙ্গকারী দেশে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করার জন্য অনেক দেশে আইন হয়েছে। অবশ্য সরকারি মদতে অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অস্ত্রের চোরাচালান করেই থাকে।

পেট্রা খুন হয়েছিলেন ২৮ বছর আগে। কিন্তু তিনি গ্রিন পার্টির মাধ্যমে যে পরিবেশ ও শান্তি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তা এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে দলনিরপেক্ষ আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

উমা

আমার কেমন দিদিমণি পছন্দ

সুস্মিতা মণ্ডল

দিদিমণি কথাটির মধ্যে একটি আন্তরিকতার অনুভূতি আছে বলে আমি মনে করি। আমার কেমন দিদিমণি পছন্দ এ নিয়ে বলতে গেলে আমার জীবনের দুটি পর্যায়ের উপলব্ধি মনে পড়ে যায় – একটি হচ্ছে আমার স্কুল জীবনের আর অপরাটি কলেজ জীবনের। স্কুলের তৎকালীন সময়ের উপলব্ধিতে গুটিকয়েক দিদিমণিকে ভালো লাগলেও ঠিক তেমন পছন্দের দিদিমণি আমি পেয়ে উঠি নি বলে আমার মনে হয়েছিল। সেই সময় মনে হয়েছিল যে পছন্দের দিদিমণি হবে সে ক্লাসের মধ্যমানের ছাত্রীটিকেও প্রাধান্য দেবে।

হ্যাঁ, আমি একজন মধ্যমানের ছাত্রীই ছিলাম বটে। আমি চাইতাম দিদিমণি তো দিদি বা মায়ের মতো – তাহলে কেন এত বাধ্যবাধকতা। তাই চরম বাধ্যবাধকতার আমি বিরোধী ছিলাম। মনে আছে ক্লাস ইলেভেনে অপরাজিতা ম্যাডাম একদিন একটি সুন্দর ঘড়ি পরে এসেছিলেন, আমি সেদিন বারবার ম্যামকে ঘড়িটি সুন্দর হয়েছে বলে প্রশংসা করেছিলাম আর মনে মনে ভেবেছিলাম ইস, ম্যাম যদি একদিনের জন্য ঘড়িটা পরতে দিতেন। হ্যাঁ, আমার মা-বাবা, দিদি তো এরকম সময়ে আমার মনের কথা আগাম জেনে যেত।

সমস্ত দিদিমণিই আমায় পড়াশোনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমি আমার প্রিয় দিদিমণি হিসাবে একজন বন্ধুকে চেয়েছিলাম আর তখন আমার মনে হয়েছিল, না আমি তা পাই নি। তবে বর্তমানে কলেজ জীবনে পৌঁছে আমার ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে; এখন হয়তো উন্মুক্ত স্বাধীনতা পেয়েছি, তবে কোথাও গিয়ে যেন মনে হচ্ছে, ইস কেউ বাধা দেওয়ার থাকলে বোধহয় ভালো হত, কলেজ জীবনে এসে শৃঙ্খলার গন্ডিটা যেন অনেকটা শিথিল। এতটাই শিথিল যে এখন মনে হয়, ধুর! বোধহয় স্কুল জীবনে দিদিমণিদের সেই শৃঙ্খলার বজ্রআঁটনি, বকুনি অনেক ভালো ছিল। এই কারণেই কয়েকবার ভুল সিদ্ধান্তে আমার কলেজ জীবনে হোঁচট খেতে হয়েছে। তাই আজ যে কোনো সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গেলে স্কুল জীবনের সব কিছুই ভালো লাগতে শুরু করেছে। আর আমি যে আমার সমস্ত ভালোলাগাকে কোনো একজন দিদিমণির মধ্যে পেতে

পেরি এই ধারণাও সঠিক হতে পারে না। তাই ঠিক আগে যেমন মনে হত আমার মা, বাবা, দিদি আমার সঙ্গে যা করে তা আমার দিদিমণিরা করেন নি। এখন তার উল্টোটাই মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, এই দেখুন কথা যে আর শেষ করতে পারছি না; যাই হোক একদিন স্কুলে হঠাৎ পিরিয়ড শুরু হয় – সুজাতা ম্যাম পারলেই তো সঙ্গে সঙ্গে ছুটি দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং তিনি স্কুলের পাশে মেডিক্যাল শপ থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে আমার হাতে দিয়ে গেলেন। দেখুন আজ সেটা ভেবেই আমার চোখে জল চলে এল। তিনি তো সত্যি সত্যি সেদিন আমার মায়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এরকম হাজারএকটা স্মৃতি আমার আজ মনে পড়ে। আর মধ্যমানের ছাত্রী হিসাবে চেনার কথা, সেদিনই আমার ধারণা বদলে গিয়েছিল। যে দিদিমণি ক্লাসে আমায় একবারও ডাকেননি, সেই নিরুপমা ম্যাম স্কুলের সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন – সুস্মিতা তোমার লাগে নি তো। হ্যাঁ আমিই হলাম সুস্মিতা মণ্ডল। তাইতো আমার এখন মনে হয় সত্যি আমিও তো ম্যামের সাথে দুটো কথা নিজেও বলতে পারতাম। বোধহয় আমাদের না পাওয়া আকাঙ্ক্ষার মধ্যে লুকিয়ে থাকে আমাদেরই অদেখা কিছু নিজস্ব ভুল, যা পরবর্তীকালে আমাদের উপলব্ধি করায়।

তাইতো আজ আমার মনে হয় আমার প্রত্যেক দিদিমণির বকুনির ও ভালবাসার সমন্বয়ই হল আমার কাছে প্রিয় দিদিমণির সংজ্ঞা। কে বলতে পারে পরবর্তী জীবনে গিয়ে আমার এই কলেজ জীবনের বিতৃষ্ণার ধারণাও পরিবর্তন হতে পারে। হতে পারে কলেজ জীবনের এই দিদিমণিদের ব্যবহার – এর পেছনেও নিশ্চয় আলাদা অভিসন্ধি আছে, যা আমি পরবর্তীতে বুঝতে পারব। আর সেই কারণেই আজ আমার মনে হয় হয়তো সবকিছুরই একটি হ্যাঁ সূচক দিক আছে। আর সব থেকে বড় কথা – প্রিয় দিদিমণি পেতে গেলে নিজেকেও তো প্রিয় ছাত্রী হয়ে ওঠা দরকার,

তাই নয় কী?

(ভূগোলে এমএসসি-র ছাত্রী)

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে মেয়েদের কথা

রিনি নাথ

প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে ধরা থাকে সমাজের ছবি। বোঝা যায়, কোন সমসাময়িক ভাবনা থেকে সেগুলোর উৎপত্তি। এ এক বিরাট বিষয়, আমরা মূলত বাংলা ভাষায় মেয়েদের ঘিরে যে সব প্রবাদ-প্রবচন তৈরি হয়েছে তা থেকে সমাজে নারীর অবস্থান, মর্যাদা কেমন ছিল বোঝার চেষ্টা করব। দীর্ঘদিন ধরে চলে-আসা প্রবাদ-প্রবচনগুলো বিভিন্ন সময়ে বহু বিখ্যাত মানুষজনও ব্যবহার করেছেন, তা থেকে প্রতিফলিত তাঁদের মানসিকতাও। উদাহরণ হিসাবে অনেকের কথা বলা যায়। ধরা যাক, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তিনি নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপমা ব্যবহার করতেন, উদ্ধৃত করতেন প্রবাদ-প্রবচন। তারই একটি ‘কান তুলসী, মুখ হলসা, দীঘল ঘোমটা নারী...’। প্রবচন মতে এই ধরনের নারী নাকি পানাপুকুরের পচা জলের মতো স্বাস্থ্যের অপকারী! কান তুলসী মানে যে নারীর কান ছোট, মুখ হলসা মানে বাচল এবং দীঘল ঘোমটা বলতে বোঝায় সেই নারীকে যে ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকে। ‘ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পীরিত হয় না’, প্রায়শই শোনা যেত বিবেকানন্দের মুখে। নারীর শক্তি-দুর্বলতা, আবেগ-নিরাসক্তি, সংস্কারাচ্ছন্নতা ও সংস্কারহীনতা, মন-মানসিকতাও প্রবাদ-প্রবচনে স্পষ্ট। বাল্য থেকে বার্ষিক্য— এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত নারীর পিছু ছাড়ে না এগুলো। নারীকে আমরা মূল তিন পরিচয়ে পাই— কন্যা, বধু ও মাতা। মেয়েবেলাটা মেয়েদের হয় কাটে আদর-যত্নে, নয় উপেক্ষায়। ‘বেটি যেন সজনে খাড়া, রোদ লেগেছে ছায়ায় দাঁড়া’ বা ‘মেয়ে যেন আউপাতালি দুগ্ধা’য় সে বাবা-মায়ের আদুরে কন্যা। বিয়ে হয়ে গেলেই সে পর— ‘তনয়া পরের ধন’। প্রবাদ বলছে— ‘বাপ রাজা তো ঝিয়ার কী/ ভাই রাজা তো বোনের কী?’

বাবার সম্পত্তি তার নয়, ভাই তো আরও দূরের। ‘শসা খেয়ে জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান,/ গুড় খেয়ে জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান।’ শস্য জল থাকে বেশি, ভাই খেলে আর জল খেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু মিষ্টি খেলে জল খেতেই হয়। বোনের প্রতি ভাইয়ের যত না টান, তার চেয়ে ভাইয়ের প্রতি বোনের টান অনেক বেশি থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেলে বা নিজের বউ এলে বোনকে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ দিতেও ভাইদের অনীহা। সে যে ‘মার সোহাগে বাপের আদর’। অবশ্য সংসারে মেয়ের থেকে ছেলের কদর বেশি। কারণ পুত্র

বংশরক্ষা করে— ‘পুতে মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি।’ মেয়ে হেলাফেলার জিনিস বলে ‘মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, আর যমে নিলেও গেলি।’ একমাত্র মায়ের কাছেই মেয়ে অযত্নের নয়। উমার জন্যে মেনকার উদ্বেগ আমাদের মনে আছে। প্রবাদ বলছে— ‘বিহানে বাদল বাদল নয়/ মায়ের-ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।’ আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। কারণ ‘মেয়েমানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়’। তাই ‘মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ করলে খেয়ে।/ হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে।’ কন্যাদায় কথাটা এখনও হারিয়ে যায়নি। হারিয়ে যায়নি দেখে-শুনে বৌ ঘরে আনার রীতিও। কীভাবে সুলক্ষণা মেয়ে চেনা যাবে, তার নিদানও রয়েছে— ‘আগ দরশন দুখানি চরণ, পাছ দরশন ঝুঁটি। মুখ দরশন হাস্যবদন বুকে মাজায় খুঁটি।’ প্রথমে পা দুটো দেখতে হবে, তারপর চুল। আর মুখের হাসি ও দাঁত। কালো বা কুশ্রী হলে মেয়েদের পাত্র না জোটারই কথা। কিন্তু গৃহকর্মে নিপুণ বা সুন্দরী হলেই যে সুপাত্র জুটে যাবে, এমন নয়। তাদেরও অনেক সময় পাত্র জোটে না। তা থেকেই ‘অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর,/ অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।’ বা ‘অতি চতুরের ভাত নেই,/ অতি সুন্দরীর ভাতার নেই।’ জাতীয় প্রবচনের উৎপত্তি। সব যুগেই দু-চারটে মেয়ে বেয়াড়া প্রকৃতির হত। ‘ধন্য মেয়ে’ ছবির মনসার মতো। সেই সব মেয়েকে জন্ম করার এক ও অদ্বিতীয় পস্থা ছিল বিয়ে দেওয়া। তাই রচিত হয়েছিল— হলুদ জন্ম শিলে, চোর জন্ম কিলে/ বেয়াড়া মেয়ে জন্ম হয় ধরে বিয়ে দিলে।’ অন্য মতে, দ্বিতীয় লাইন— ‘পাড়াপড়শী জন্ম হয় চোখে আঙুল দিলে।’

বিয়ের পর বরের ঘরই মেয়েদের কাছে সব। এই মন্ত্রই গুরুজনেরা মেয়েদের কানে দিতেন। মেয়েরা আশৈশব তা শুনে শুনে বিশ্বাসও করত। তাই তো শ্বশুরবাড়ির নিন্দে তাদের গায়ে লাগত। তা থেকেই ‘মা কয় পর পর/ মা করে কার ঘর?’ কথার উৎপত্তি। শ্বশুরবাড়িকে মা ‘পর’ বলে উল্লেখ করায় মেয়ে মাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে, সে (মা) তবে কার ঘর করছে? স্বামী কুরূপ বা বিকলাঙ্গ হলেও, সে-ই তার আপনজন - ‘মা কয় ঝি ঝি/ ঝি কয় আমার কানা হাই-ই ভাল।’

মেয়েদের জীবনে বধূবেলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অচেনা-অজানা পরিবেশে, নানা প্রতিকূলতায় নিজেকে মানিয়ে চলার কঠিন

পরীক্ষা। যেখানে আছে দজ্জাল শাশুড়ি আর ‘ননদি বিষের কাঁটা, অহরহ দেবে খোঁটা’। আক্রমণের প্রথম বড় এসে পড়ে গায়ের রঙ কালো হলে— ‘বউটি ভালো কালো/ পাটনা থেকে হলুদ এনে, গা করিব আলো।’ অবশ্য কোনো কোনো প্রবীণার মতে— ‘বউ করো কালো, তাই গেরস্থের ভালো।’ কারণ, রূপসী মেয়ের দেমাকে মাটিতে পা পড়বে না। সে ‘পটের বিবি’ হয়ে থাকবে। বউ সুন্দরী হলেও অল্প দিনেই স্বামীর মোহ কাটে। তখন ‘পরের বউ দেখতে ভালো, নিজের বউ বেজায় কালো’ ঠেকে। বউয়ের বাবার দেদার ধনসম্পদ থাকলে তার একটা জোর থাকে, যেমনটা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসে পেয়েছি। নইলে কায়িক শ্রম দিয়ে শ্বশুরবাড়ির মন পেতে হয়— ‘ধনীর বেটি ধনে মানায়,/ নির্ধনের বেটি গতরে মানায়।’ শুধু গতরে হবে না, দক্ষতাও চাই— ‘তুমি কেমন বড়মানুষের বি/ তা কাঁচকলাটা কুটতে দেখে/ খোসায় বুঝেচি।’ বা ‘বউ ভাত রন্ধেছে চোঁয়া পোড়া/ ডাল রন্ধেছে তিনটি কড়া,/ তবু রাঁধে রাঁধে বলে পড়েচে সাড়া।’ বাবার টাকা নেই, এদিকে স্বামীও বেরোজগেরে হলে মেয়েদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। তাদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, ‘বাপ নির্ধন সোয়ামি কুঁড়ে,/ কে দেবে মোর অলঙ্কার গড়ে।’ বৌয়ের চালচলনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকে শাশুড়ি-ননদদের। তার সু-কু লক্ষণও থাকে। যেমন, ‘দুবদুবিয়ে হাঁটে নারী চোখ পাকিয়ে চায়।/ আটকপালী হতভাগী পুরুষ আগে খায়।’ দুপদাপ আওয়াজ করে চলাফেরা করা, চোখ পাকিয়ে তাকানোর মধ্যে নাকি ওদ্রুত প্রকাশ পায়। স্বামীকে আগে খেতে দিয়ে পরে খাওয়ার যে রীতি, তারও ধার ধারে না। তখনকার দিনে গৌরীদান ছিল আদর্শ। আট বছর বয়সে বিয়ে। এতে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পোষ মানাতে সুবিধে হত কারণ ‘ধাড়ী পোষ মানে না।’ তাছাড়া ‘বিয়ের জল পেলে, কনে ওঠে বেড়ে।’ ঠিক-ভুল করতে করতে কাজ শেখে— ‘ছিঁড়া ছিঁড়া কাটুনী, পুইড়া পুইড়া রাঁধুনী’ বা ‘ছিনে কুটে কাটুনী, পুড়ে বুড়ে রাঁধুনী।’ শুধু রান্না করলেই হবে তাকে হতে হয় সর্বগুণসম্পন্ন— ‘যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে।’ সংসারে স্বামীরাই মেয়েদের বলভরসা। কিন্তু সেই খুঁটিও নড়বড়ে হয়, পচা কাঠের হয়। তাই ‘যারে সোয়ামী করে হেলা,/ তারে রাখালে দেয় ঠেলা।’

একটা সময়ে বহুবিবাহের চল ছিল। মেয়েদের সতীনের জ্বালাও সহ্য করাটাও প্রাপ্তিবয়োগের অঙ্গ ছিল। সেই ‘রামায়ণ’ থেকে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র গল্পে চমৎকারভাবে ধরা আছে অত্যাচারী সতীনের কথা। অবধারিতভাবে সতীন নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবাদ-প্রবচন। যেমন, ‘যে মেয়ে সতীনে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে’, ‘সতীনের যা সওয়া যায়, সতীন-কাঁটা চিবিয়ে খায়’, ‘সতীনের পুত, সুন্দরও ভূত’, ‘সতীনের পেলে দুনো খাই, পেটের বিশেষ ঘুম নাই’, ‘সতীনে সতীনে বাদ, প্রতি কথায়

প্রতিবাদ, ‘সতীনের ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকে চূপ মেরে থাক’ ইত্যাদি। এগুলোতে নারীমনের জটিলতা, তার ঈর্ষা-বিদ্বেষ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ক্ষমাহীনতা, আক্ষেপ-অভিমান বিচিত্রবর্ণে প্রতিফলিত। স্বামীকে ঘিরেই মেয়েদের সংসার জীবন আবর্ত হয়। সে স্বামীর ভাগ-বাটোয়ারায় রচিত হয়— ‘এক চির পান দু’চির হল,/ সোনার সিংহাসনে ভাগ বসল।’ শক্তিমান পুরুষ চায় ভোগবৈচিত্র্য। পুনর্বিবাহে তার প্রবল আগ্রহ। নতুন একজনকে পেয়ে পুরনোকে অনাদরেও তার আপত্তি নেই। উদাহরণ হিসাবে রূপকথার সুয়োরানী-দুয়োরানী তো রয়েছেই। দুয়োরানীর দুর্গতি রূপকথার গল্পের ছত্রে ছত্রে— ‘ছোট মাগ পাটারানী, বড় মাগ ধান ভানানী।’ অনেক জ্বালায় নারী সতীনের মৃত্যুকামনাও করে— ‘পাখি পাখি পাখি/ সতীনকে নে’ যায় গঙ্গায়, আমি বসে দেখি।’ অনেক বাবা-মা এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাঁরা সতীন আছে যে ঘরে, সেই ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না— ‘গাছের গোড়ত নি বুনি ক্ষেতি,/ সতীন দেখে না দি বেটি।’ অবশ্য কৌলীন্য প্রথা একটা সময় জাঁকিয়ে চলছিল। কুলরক্ষার তাগিদে একই পাত্রের সঙ্গে অনেক মেয়েরই বিয়ে দেওয়া হত। কখনও বংশরক্ষা, কখনও রূপমুগ্ধতা বা অন্য কারণে পুরুষ একাধিক বিয়ে করত। নিজের শ্যালিকাকে বিয়ে করার নজিরও অজস্র। মধ্যযুগে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে ধনপতি সওদাগরের দুই পত্নীর মধ্যে আছে তার নিদর্শন। স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করা মানে স্ত্রীকে কতখানি দুঃখ দেওয়া, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি বা মানবিকতাও থাকত না পুরুষটির। তাই নারীর অন্তর বলে উঠেছে— ‘আন সতীন তবু সয়, বোন সতীন কতু নয়।’ আবার স্বামী মারা গেলে দুই সতীনের মিলন হতেও দেখা যায়— ‘পতি মল্ল ভালো হল, দুই সতীনে পিরীত হল।’ এ যেন ঈর্ষা-কলহের যা মূল, তা-ই না থাকা! পতিবিয়োগের দুঃখ দুই নারীকে কাছাকাছি এনে দিত।

কথায় বলে, মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। বিয়ের পর মেয়েদের শাশুড়ি ছাড়াও প্রধান শত্রু হয়ে উঠত বা এখনও হয়ে ওঠে ননদ, জায়েরা। অত্যাচার আর বিদ্রোহে জর্জর হয়ে অবসাদে, বিষণ্ণতায় সে বলে ওঠে— ‘দেখে শুনে বড় ঘরে বিয়ে দিল বাপে,/ এখন মরি জায়ের আর ননদের তাপে।’ ননদকে তো কখনও রায়বাঘিনী, কখনও কালসাপিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (‘ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী’)। হয়ত বাড়িতে-আসা নতুন সদস্য তার থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে ঈর্ষার জ্বালায় ক্রমাগত হল ফুটিয়ে চলে। বাড়ির অন্যদের মন বিষিয়ে চলে। কখনও বা রূপ-গুণ-চালচলন নিয়ে খোঁটা দিয়েই চলে। প্রবাদের সংহত গঠনেও সেই ইতিহাস গোপন থাকে না— ‘ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা।’ ননদিনীর এই সমালোচনা, নিন্দা, অপবাদ নিজের সংসারেই

সীমাবদ্ধ থাকে না, পাড়ায়-পাড়ায় তাকে অপদস্থ করার কাজটিও সে করে চলে, ‘ননদিনী রায়বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছা গায়।’ স্বাভাবিকভাবেই বিধ্বস্ত অপমানিত মেয়েটি ননদিনীর মরণ কামনা করে বসে, ‘ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়।’ অভিজ্ঞা অন্তঃপুরিকাদের তাই সাবধানবাণী— ‘দিও না ননদ-নাড়া, এর পরে শুনবে বাড়া।’ তার মানে, ননদকে বেশি ঘাটিও না।

সংসারে ননদকে যিনি শাসনে রাখতে পারেন, তিনি হলেন বধুর শাশুড়ি। কিন্তু প্রায়ই তিনি কন্যার কথায় প্রভাবিত হন। মেয়ের সঙ্গে নিজেও বউয়ের সমালোচনা করেন, উঠতে বসতে খেঁচা দেন। নানাভাবে বধুকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন। কখনও নিগূহীতও করেন। এক সময় শাশুড়িরা বৌদের চোয়ালে ঘুঘি মারার মতো এক ধরনের টোকা মারত, তাকে বলত ‘ঠোনা’। ব্যাপারটা বেশ জনপ্রিয় ছিল। বৌদের মারা নিয়ে প্রবচন— ‘নিধের মায়ের চালে ঝিঙে, বউকে মেরে বাজায় শিঙে।’

ছেলের উপর, সংসারের উপর সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে হয় ছেলের বউয়ের হাতে। অন্তরে জ্বলন তো হবেই। তাই পরের মেয়ে তাঁর কাছে নিজের মেয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে না। নিজের মেয়ের বড় বড় অপরাধও ক্ষমার যোগ্য, অথচ নববধুর সামান্য অপরাধই অনেক বড় হয়ে ওঠে— ‘মেয়ে ভাঙলে কাঁসি, পড়ল একটা হাসি।/ বউ ভাঙলে সরা, গেল পাড়া পাড়া।’

এই চিত্র আবহমানের। এখনও এর যে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে এমন নয়। আসলে যুগ বদলায়, মানুষের মন বদলায় না। বিশেষত গৃহটাই যাদের পৃথিবী, তারা আপনজনকে নিয়ে অনেক বেশি অধিকার-সচেতন। অবশ্য রাজত্বের অধিকার কে-ই বা ছাড়তে চায়, তা সে দেশই হোক অথবা মনোরাজ্য! তাই পুত্রবধুর উপর শাশুড়ির এত রাগ, এত বিদ্বেষ— ‘ঝি-জামাই সোনার দলা, তারে দিলাম সবরী কলা।/ পুতের বউ বাঘিনী, তারে দিলাম ঝাটানি।’ এই রাগ-বিদ্বেষ থেকেই তো উঠে আসে অপরাধপ্রবণতা। একসময় সেই প্রবণতা বধুকে নানাভাবে হেনস্থা করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত। বর্তমানে তা বধুনির্ঘাতন, কখনও হত্যার মতো অপরাধের জন্ম দিচ্ছে। বাংলায় একটি প্রবাদ ঘরে ঘরে অতি প্রচলিত ছিল, আছেও— ‘যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।’ বস্তুত অপছন্দের মানুষটির রূপগুণ যাই থাক, ক্রটি চোখে পড়বেই। আর পল্লীবাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অতি স্নেহপ্রবণ মায়েদের চোখে নিজকন্যার চেয়ে সুন্দরী আর কেউই নয়। পক্ষপাতমূলক এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ধরে রেখেছে বাংলা প্রবাদ এইভাবে— ‘পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়/ খেঁদানাকী বউ এসে বাটার পান খায়।’ এই ধরনের প্রবাদগুলিতে মেয়েকে পরের বাড়ি পাঠানোর দুঃখ, সেখানে মেয়ের আদর-যত্ন বা ভালো-মন্দের চিন্তা যেমন আছে, তেমনি পরের বাড়ির মেয়ে এসে তার সংসারের সম্পদের ভাগীদার হবে, সেজন্য বিদ্বেষের

মধ্যে মানসিক দৈন্যের পরিচয়ও আছে। বাংলার ঘরে ঘরে এই চিত্র আগেও ছিল, এখনও আছে। একদিকে অধিকারবোধ থেকে জাত ঈর্ষা-বিদ্বেষ, আর একদিকে বধুকে নিজের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ববোধ— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে বড়ই জটিল সম্পর্ক বাংলার শাশুড়ি-বউয়ের। এই কারণে ধ্বনিত হতে শোনা যায় সাবধানবাণীটিও— ‘মা ঝি যেখানে বউয়ের ভাত নেই সেখানে।’ প্রতিদানও অবশ্য খুব একটা ভালো মেলে না। শাশুড়ি যদি বউমাকে ভালো না বাসতে পারেন, বউটিই বা তাঁকে ভালবাসবে কেন? একই ছাদের তলায় বাস করেও তাই দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে না কোনও স্নেহ-প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক। থাকে শুধু অভ্যাস, কেবলই মানিয়ে চলার মনোবৃত্তি। আর তাই শাশুড়ির মৃত্যু হলে বউয়ের মধ্যে জেগে ওঠে না শোকের অনুভূতি। সে বলে— ‘শাশুড়ি ম’ল সকালে।/ খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদবো আমি বিকালে।’ এই কান্না নেহাতই লোকদেখানো শোকের প্রকাশ। না হলে পাড়াপড়শীর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। আসলে এই মৃত্যু যেন তার কাছে মুক্তির নামান্তর। ‘ননদিনী শ্বশুরবাড়ি, শাশুড়ি যমের বাড়ি’, তাই আর কারও থেকে অত্যাচারিত হওয়ার ভয় নেই তার। আছে সংসারের একচ্ছত্র অধিকার, ইচ্ছামতো চলার স্বাধীনতা, আচার-আচরণ পালনের বিধিনিষেধের হাত থেকে মুক্তির অনুভব— ‘শাশুড়ি নেই, ননদ নেই, কার বা করি ডর।/ আগে খাই পাস্তাভাত, শেষে লেপি ঘর।’

শাশুড়ি থাকতে তাঁর নির্দেশে বধুকে সকল আচার পালন করতে হত বিনা প্রতিবাদে। বাসি ঘরদোর আগে পরিষ্কার করে, নিজে জামাকাপড় ছেড়ে, সংসারের শতক কাজ সেরে তারপর মিলত খাওয়ার অবসর। প্রতিবাদের জো ছিল না। তাই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাতেই কোনও কোনও মেয়ে বলে ওঠে, ‘বর বর তোমার ক’খানি ঘর?/ আমি গিয়েই হব স্বতন্তর।’ স্বতন্তর অর্থাৎ স্বতন্ত্র। গ্রামের ভাষায় ভিন্ন। আবার শাশুড়ি-বৌয়ের বৃদ্ধির লড়াইও কম চলে না— ‘শাশুড়ি যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ,/ বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ।’ তবে এর যে ব্যতিক্রম দেখা যায় না তা নয়। শাশুড়ি-বউয়ের মিলেমিশে থাকার দৃষ্টান্তও অনেক। আর দুজনে মিলমিশ দেখেই প্রবাদকার বলেন, ‘শাশুড়ি-বউয়ে ভাব থাকলে মাচার ধানেও ভাত হয়।’

সংসারের আরও এক মহিলা সদস্য জা। সাধারণত ভাসুরের বউ। তার সঙ্গে নববধুর সম্পর্ক বাইরে থেকে মধুর, ভিতরে বিপরীত। রসিক রচয়িতা জানাচ্ছেন, ‘পচা সুপারি পাকা পান, ভাজের কথায় এত টান।’ তবু শ্বশুরবাড়ির অন্য সব মহিলার তুলনায় জা-কেই তার বেশি আপন মনে হয়। কারণ তারই মতো জা-ও পরের বাড়ির মেয়ে— ‘জা-জাইলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর/ শাশুড়ি মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর।’



লবণ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল

ভবানীপ্রসাদ সাহু

লোনা ঘাম লোনা রক্ত • রবীন্দ্রনাথ মিশ্র • সেতু প্রকাশনী • ২৫০ টাকা

লেখক পেশায় চিকিৎসক; পশ্চিমবঙ্গের অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রকূলবর্তী এলাকার ভূমিপুত্র। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি, দীর্ঘদিন তিনি এলাকার হতদরিদ্র লবণ শ্রমিকদের নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণামূলক কাজ করে গেছেন, মানবিক সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তারই ফসল আলোচ্য এই গ্রন্থটি।

কয়েক শত বছর ধরেই ঐ সব এলাকায় অসংখ্য শ্রমিক সমুদ্রের লোনা জল থেকে লবণ তৈরি করতেন। এঁদের নাম ‘মলঙ্গী’। রোদে পুড়ে, সমুদ্রের লোনা জলে ভিজে বছরে কয়েক মাস এঁরা অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। নিজেদের এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার নুনের চাহিদা মেটাতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে শাসন ক্ষমতায় আসার পর এই অত্যাবশ্যক পণ্য উৎপাদনকেও তাঁরা শাসন-শোষণের অন্যতম উপায় হিসেবে গড়ে তোলে। সঙ্গে হাত মেলায় এ দেশীয় জমিদার ও ধনাঢ্য গোষ্ঠী।

মলঙ্গীদের জীবন-সংগ্রামের ছবি তুলে ধরার পাশাপাশি লবণের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর চাপিয়েছে বা ১৮৬২-৬৩ সাল থেকে লবণ আইন করে দেশীয় লবণ উৎপাদন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হল— এ সবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে বইটিতে। ইংল্যান্ডের কেশায়ার ও লিভারপুল থেকে আমদানি করা লবণে দেশ ছেয়ে গেল। যেমন, ১৮৫১ সালে ভারতে আমদানি-করা লবণের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০ মেট্রিক টন। রয়েছে এই ধরনের অজস্র তথ্য এবং রয়েছে এ দেশে, বিশেষ করে তৎকালীন মেদিনীপুরের ঐ অঞ্চলে লবণ আন্দোলন ও তার শহিদদের কথা, সঙ্গে মূল্যবান সংযোজন বিরল কয়েকটি ছবি।

নিজের অনুসন্ধানী কাজের পাশাপাশি প্রায় ৪০টি ঐতিহাসিক গ্রন্থ

ও উৎস থেকে লেখক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন, বলাইচন্দ্র বারুইয়ের ‘সল্ট ইন্ডাস্ট্রি অফ বেঙ্গল ১৭৫৭-১৭৮০’ থেকে শুরু করে হ্যামিল্টন হেনরির ‘নোটস অন ম্যানুফ্যাকচার অভ সল্ট ইন তমলুক এজেন্সি, মিদনাপুর, ১৮৫২’ ইত্যাদি।

আগ্রহী পাঠক ও গবেষকেরা লবণ-শ্রমিক ও মলঙ্গীদের সম্পর্কে এবং লবণ আন্দোলনের উপর বইটির এক মলাটের মধ্যে বহু মূল্যবান তথ্য পাবেন। বাংলা ভাষায় শুধু এই বিষয়ের উপর অন্য কোনো বই সম্ভবত নেই। শুধু লবণ-শ্রমিক নয়, ভারতের সামগ্রিক শ্রমিক-আন্দোলনেরও সম্পৃক্ত অংশ সংক্রান্ত আন্দোলন।

তথ্য রাখার স্বার্থেই হয়তো, দু-এক জায়গায় তথ্যের পুনরুল্লেখ আছে। কিন্তু এতে বইটির গুরুত্ব কমে না। ছাপা, বাঁধাই ভালো। বানান ভুল প্রায় নেই। প্রচ্ছদটিও মূল্যবান। ১৯৩০ সালে স্থানীয় পিছাবনি (দীঘার ২১ কিলোমিটার আগে) এলাকায় লবণ সত্যগ্রহীদের সমাবেশের ছবি। তখন খালের ওপর বাঁধানো সেতু ছিল না। কাঠের ‘চাপ’-এ বা নৌকায় খাল পেরোনো হত। ঐ নৌকার উপরেই সত্যগ্রহীরা সমবেত হয়েছিলেন। ছবিটির উপরে স্থানীয় এলাকার প্রাচীন মানচিত্র রয়েছে।

সব মিলিয়ে এমন একটি বই শুধু ঐ এলাকার ইতিহাসে আগ্রহী ব্যক্তির নন, শ্রমিক-আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিরও সংগ্রহ করতে পারেন। সব পাঠাগারেও বইটি রাখলে ভালো। বাংলার এই গোষ্ঠীর শ্রমিকদের ঘাম-রক্ত-সংগ্রামের বিবরণ পাওয়ার জন্য এ ধরনের বই অতীব মূল্যবান।

উমা

রবীন্দ্রনাথ মিশ্রের বইয়ের সমালোচনাটি যখন জমা পড়ে তখন উনি রোগশয্যায়। আমাদের আফসোস, উনি নিজের বইয়ের সমালোচনাটি আর দেখে যেতে পারলেন না। সঃ



গণ-উন্মত্ততার এক সূক্ষ্ম কারণ আইন-কানুনে অনাস্থা

মাননীয় সম্পাদক

উৎস মানুষ সমীপেষু

আপনাদের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী শঙ্করনাথ দাসের ‘গণ-উন্মত্ততা’ প্রবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। এ জাতীয় একটি প্রবন্ধের জন্যই যেন অপেক্ষায় ছিলাম। ‘গণ-উন্মত্ততার’ পশ্চাদপট তিনি নানাভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং শেষে ঘটনাগুলির সাধারণীকরণ (generalisation) করেছেন যথেষ্ট দক্ষতার সাথে।

তবুও আমার মনে হয়েছে তাঁর বর্ণিত পশ্চাদপটের পিছনে আরও কিছু ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তর (layer) আছে যা আমি ব্যক্ত করতে চাইছি এই চিঠিটির মাধ্যমে। দেশের বিভিন্ন ‘গণ-উন্মত্ততা’ প্রকট হলেও আমাদের রাজ্যটাকেই বেশি চিনি বলে আমার বক্তব্য মূলত এ রাজ্যকে ভিত্তি করেই।

(১) গণ-উন্মত্ততার একটি সূক্ষ্ম কারণ হল দেশের আইন-কানুন, প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর ধীরে ধীরে অনাস্থার বাতাবরণ তৈরি করা। অনেক ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় করে তোলা। আমাদের দেশে “আইন-অমান্য” একটি রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক আন্দোলনের অংশ। এই আন্দোলন অনেক সময়েই শান্তিপূর্ণ থাকে না। পুলিশ-জনতার সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের হামলা বা গুলিতে হতাহতের খবর পাওয়া যায়। আজ যে শাসকদল এ জাতীয় আন্দোলনকে নিন্দেহমন্দ করে কিছুকাল পরে তারা বিরোধী দলে পরিণত হোয়ে এ জাতীয় আন্দোলনে নেমে পড়ে। এ রকম আন্দোলনে জড়িত থাকা ব্যক্তিদের অনেকেই ‘খ্যাতনামা’ হোয়ে বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেন।

এঁদের দেখেই তো সাধারণ মানুষজন শেখে এবং শেখে নৈরাজ্যের সাধনা। (২) এই গণ-উন্মত্ততায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির কারণে তা নিয়ে কোনো সমীক্ষা হয়েছে কী? আমার ধারণা মানসিক চাপ (বা ক্ষোভ) নিয়ে ফুঁসতে থাকলেও তার প্রকাশে মত্ততা দেখায় সাধারণত নিম্নবিত্ত, কর্মহীন বা কিছু পেশাদার ধ্বংসাত্মক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রবন্ধকার যেমন বলেছেন বিশেষ কারণ নয় থাকলেও এরা তাদের সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কিছুক্ষণের মধ্যে তাগুবে পরিণত

হয়। এ রকম সৃষ্টিকারীদের ক’জন সাজা পায়? এদের মধ্যে যারা পেশাদার বা দুর্দান্ত প্রকৃতির তারা জানে আইনি সাজা পাবার সম্ভাবনা খুবই কম; কাজেই তারা নেতৃত্ব দিতে সদা প্রস্তুত থাকে। (৩) আমাদের দেশে আইন-প্রক্রিয়া যে কত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তার উদাহরণ অনেক আছে। ফৌজদারি মামলা মিটতেই ২০/২৫ বছর লেগেছে এমন ঘটনাও আছে। প্রমাণাভাবে অনেক অভিযুক্ত ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে এসে আবার দুর্বৃত্তগিরি শুরু করলেও তা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকারবিহীন থেকে যায়। শাসকদলের প্রচ্ছন্ন মদত থাকলে পুলিশ উদাসীন হোয়ে থাকে। অভিযোগকারীই ভীতিগ্রস্ত তখন। তার মনে ক্ষোভ জমে না? যে সমাজ আইনের শাসনের মর্যাদা হ্রাস পায় সেখানে সমাজজীবনের বন্ধন পলকা হতে থাকে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের জায়গায় বিদ্বেষের বিষবাষ্প জমতে থাকে। নিরীহ, শান্তশিষ্ট লোকও ক্ষোভের তুষের আগুনে পুড়তে থাকে। ভাঙচুর, গণপিটুনিতে অংশ না নিলেও বাধা দিতে চায় না, হয় বাহবা দেয় বা বেশ করছে বলে স্থান ত্যাগ করে। (৪) অসম্ভবের প্রতিশ্রুতি, নিষ্পলকে অমৃত ভাষণ বাগাড়ম্বর, রাজনৈতিক বা দলীয় সংকীর্ণতা, দুর্নীতির প্রশ্রয়দান এ সব আমাদের দেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতার মূলধন। প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া, আকাশকুসুম না ফোটা, যোগ্যতার অসম্মান বহু তরুণ তরুণীকে বঞ্চনার ক্ষোভ বুকে নিয়ে জীবনযাপন করতে থাকে। বাইরে থেকে বোঝা না। অপেক্ষা শুধু কোনো একটা ‘অবান্ত্রিত’ ঘটনা। বঞ্চনার বোমার বিস্ফোরণ ঘটে ধুন্দুমার কাণ্ড শুরু হয়। এসব কাণ্ড শেষ পর্যন্ত আইনি শাস্তি না থাকার দরুণ উন্মত্ততা বিচার বিবেচনার ধার ধারে না। (৫) গণ-উন্মত্ততার সৃষ্টি প্রসারে সংবাদে নানা মাধ্যম ও রাজনৈতিক উস্কানিও কম দায়ী নয়। Social Media অর্ধ-সত্য, মিথ্যা যাচাই না করে উত্তেজক তথ্য ছড়িয়ে, টেলিভিশনে নানা কায়দায় সংবাদ পরিবেশনে উত্তেজনার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে – যা শুকনো বারুদের মতো। সহিষ্ণুতা, বিচার বিবেচনার বেড়া ভেঙ্গে শুধু একটা অন্ধ তাড়নায় কিছু মানুষ দলবদ্ধভাবে একে অপরের ওপর চড়াও হয় বা অপরিচিত মানুষকে নানা

কল্পিত অপরাধে অপরাধী ধরে নিয়ে সর্বাধিক হিংস্রতা নিয়ে বিষবাস্প উদ্দিগরণ করতে থাকে।

এই সামাজিক ব্যাধি নিয়ে অনেকেই উদ্ভিগ্ন এবং প্রতিবিধান নিশ্চয় খুঁজছেন। আমার মতে তিনটি দিক দিয়ে এর চিকিৎসা প্রয়োজন যেমন - (ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, (খ) সত্য, ন্যায় ও স্বচ্ছতাকে জীবনের নিত্য সহচর করে তোলা, (গ) আর্থিক বৈষম্য যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

জানি এগুলির রূপায়ণ ধৈর্যসাপেক্ষ, সাধনা, শিক্ষাসাপেক্ষ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার সমর্থনসাপেক্ষ। চেষ্টা করে আমরা বেশিরভাগ এগোই না।

নমস্কারান্তে

স্বপন ভট্টাচার্য

চন্দননগর, হুগলি

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেসাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উবুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন

নম্বর: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

ভুল, দুঃখিত

গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যায় ‘স্মরণ এ কে রায়’ শীর্ষক লেখায় অনবধানে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গিয়েছে।

পৃষ্ঠা ১২, ২য় কলামে দ্বিতীয় লাইন— র্যাক

পৃষ্ঠা ১৩, ২য় কলামে পাঁচ নম্বর লাইনে— মুরলীডী।

পৃষ্ঠা ১, ১ম কলামে ১৪ নম্বর লাইনে— গোলকডিহ।

পৃষ্ঠা ১৪, ১ম কলামে, ২৯ নম্বর লাইনে— আগত।

পৃষ্ঠা ১৪, ২য় কলামে ২য় প্যারার ৪ নম্বর লাইনে— খনি

পৃষ্ঠা ১৪, ২য় কলামে ২য় প্যারা ৫ নম্বর লাইনে— কাচ্ছি, অরল

পৃষ্ঠা ১৪, ২য় কলামে ২য় প্যারার ৬ নম্বর লাইনে— পাশি

পৃষ্ঠা ১৪, ২য় কলামে ২য় প্যারার ২০ নম্বর লাইনে— কামগার

পৃষ্ঠা ১৪, ২য় কলামে ২য় প্যারার ২৫ নম্বর লাইনে— সাধন

পৃষ্ঠা ১৫, ২য় কলাম ৯ নং লাইনে— বহালী/ ১০ নং লাইনে বহালী

পৃষ্ঠা ১৫, ২য় কলামে ১৪ নম্বর লাইনে— কাওরাস

পৃষ্ঠা ১৫, ২য় কলামে ২য় প্যারার ১নম্বর লাইনে— গজলীটার/ ২ নং লাইনে— চন্দবা

পৃষ্ঠা ১৫, ২য় কলামে ২য় প্যারার ৪নং লাইনে— টুঙীতে

পৃষ্ঠা ১৬, ১ম কলামে ১ম প্যারার ২২ নং লাইনে— লাস

পৃষ্ঠা ১৬, ১ম কলামে ২য় প্যারাতে ৩০ নং লাইনে— স্টেট/ ৩১ নং লাইনে— দাবিতে

পৃষ্ঠা ১৭, ২য় কলামে ৩৪নং লাইনে— গাজর এবং লাঠির

পৃষ্ঠা ১৮, ১ম কলামে ২৭ নং লাইনে— বোম

পৃষ্ঠা ১৮, ১ম কলামে ২৮ নং লাইনে— রণধীর


পৃষ্ঠা ১৮, ২য় কলামে ৪নং লাইনে— সাথী২

পৃষ্ঠা ১৮, ২য় কলামে ৬নং লাইনে— করেছে

জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সংখ্যায় ভবানীপ্রসাদ সাহুর লেখায় থামের নাম সব জায়গায় ‘নেরা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঠিক নামটি হল ‘ফেরা’।

উৎস মানুষের বইপত্রের

নতুন দুই ঠিকানা

১)  দেশি-বিদেশি পাঠক অনলাইনে আমাদের বইপত্র পেতে হলে যোগাযোগ করুন

‘হারিত’-এর সঙ্গে। ওদের ঠিকানা: <https://haritbooks.com>

২) নতুন-পুরনো বইয়ের সঙ্গে চায়ের মৌতাত। কলেজ স্ট্রিটের নতুন ঠেক ‘এক কাপ চা’। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পিছনে রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে। এই নতুন ক্যাফেটেরিয়াটি প্রদীপ বারিকের মস্তিষ্কপ্রসূত। এখানে বই পড়া যায় চায়ের সঙ্গে। অনলাইনে কেনাও যায়। ঠিকানা: <https://prohar.in/book-shop-in-college-street-offering-you-tea>